প্রথম প্রকাশ :
— অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

শ্রীঅনিলকুমার দাস
শ্রীশচীনন্দন মিত্র
শ্রীমাধব মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

সুন্দরবনের আতঙ্ক



আপনি যদি শিকারী হন, কিংবা জঙ্গলের কাহিনী পড়তে ভালবাসেন, অথবা প্রকৃতির বন্য-উদ্দাম সৌন্দর্য উপভোগের বাতিক থাকে—তাহলে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সব থেকে সুন্দর ও সব থেকে বিপদ-সঙ্কুল অঞ্চল হিসাবে যার খ্যাতি, সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দ্বীপ সুন্দরবন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আগ্রহ অনুভব করবেন। এমন অপূর্ব জল-জঙ্গলের ঠিকানা ভূ-ভারতে আর কোথাও আছে কি-না আমার জানা নেই।

রূপ! হ্যাঁ—রূপে-রূপে অপরূপ সুন্দরবন। প্রকৃতি দু'হাত উজাড় করে যেন ঢেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্যের যত ডালি জনমানবশূন্য এই নোনা-বাদায়। নিত্য নূতন খেয়াল খুশীতে 'ডগমগ' খেয়ালী সুন্দরবন। সাধ্য কি যে, সে রূপের বর্ণনা দিই, শুধু দেখি আর ধন্য হই, নয়নে নয়নে নয়নাভিরাম। দু'চোখের মুগ্ধ তারায় নৃত্য করে সবুজের মেখলায় রূপসী সুন্দরবন!

এ-হেন সুন্দরবন যদি আপনার দেখা না হয়ে থাকে, যদি জনমানব-শূন্য সেই নিরালা বন্য-বাদায় নিশুতি রাতে মরালীর গান না শুনে থাকেন, যদি জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত অভিসারে অরণ্য-গহনে স্বপ্নের মেলায় হারিয়ে যেতে না পারলেন, যদি সেই ভয়াল সুন্দরকে দুঃসাহসে বুক বেঁধে ঠাঁই দিতে না পারলেন, তাহলে বলবো—আপনার অরণ্য-পরিক্রমা পূর্ণ হয়নি। সব বন বার বার, সুন্দরবন একবার···!

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রখানা যদি কখনো সামনে তুলে ধরেন তো আপনার অভ্যস্ত চোখে দেখতে পাবেন নীচের দিকে হালকা নীল রং দিয়ে বোঝান হয়েছে ভারতের পবিত্রতম গঙ্গা নদীর মোহানা।

যে-গঙ্গার উৎস দেবভূমি হিমালয়ের চির-তুষারাবৃত দুর্গম 'গো-মুখীতে', তারপর সেই প্রচণ্ড উত্তাল মহাবেগকে জটায় ধারণ করেছিলেন মহাদেব গঙ্গোত্রীর পাহাড়ে। পরে ভগীরথ তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন মহাদেবের জটার বন্ধন থেকে সাগরে। সেই সুদীর্ঘ দুর্গম শিবালিক পথ পার হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি প্লাবিত করে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী গঙ্গা অনন্ত জলরাশি নিয়ে আজও কুলু-কুলু নাদে গৈরিক রঙে বয়ে চলেছে। কত পাহাড়-পর্বত, রুক্ষ প্রান্তর, কত নগর জনপদ অতিক্রম করে কোথাও ভাঙ্গনে-প্লাবনে ভয়ঙ্করী রূপ, আবার কোথাও শান্ত ধীর, সৃজনে-পালনে শস্য-শ্যামলা। হাজার হাজার মাইল পথ চলায় সৃষ্টি হয়েছে কত শাখা-নদী, উপনদী-পুষ্ট হয়েছে কত খাল-বিল, কত অজস্র ধারা, বার বার মিলিত হয়েছে কত নদ-নদীর সঙ্গে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে কত নামে। সুদীর্ঘ পথ চলার শেষে মিলন হয়েছে গঙ্গার বঙ্গোপসাগরে।

বিপুল জলরাশির সমুদ্র-সঙ্গম উচ্ছ্বাসে মোহানার ঘূর্ণাবর্ত নোনা-জল ঘোলাটে, কর্দমাক্ত, ফেন-বহুল।

এই মোহানার উপরই লক্ষ্য করবেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে সু-ন্দ-র-ব-ন। যেখানে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ! গঙ্গা ও যমুনার অবিরল স্রোতের ধারা এঁকে-বেঁকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এই বন্য দ্বীপগুলোকে ঘিরে প্রচণ্ড বেগে নেমে এসেছে সাগর-গর্ভে। দক্ষিণ অঞ্চলের ধারাগুলি গঙ্গার জলে পুষ্ট, আর পূর্বাঞ্চলের ধারাগুলি যমুনার জলে পুষ্ট।

দক্ষিণ অঞ্চলের এই ধারাগুলির নাম—হুগলী নদী, বড়তলা নদী, সপ্তমুখী, ঠাকরুন, বিদ্যা, মাতলা ও গোসাবা। আর—সবশেষে দেখবেন রায়মঙ্গল বা হরিণভাঙ্গা, ব্যস—আর ওপাশে যাবেন না। দ্বি-খণ্ডিত বাংলার বুক চিরে ওখানেই পাঁজরার হাড় খুলে পোঁতা হয়েছে রাজনৈতিক বেড়া। সীমানা লঙ্ঘনের অপরাধে নিশ্চয়ই আপনি অপরাধী হতে চান না। রায়মঙ্গলের পাশেই যমুনার জলে পুষ্ট মালঞ্চ,

কাঙ্গা বা পামার যদি ডাকে, যদি আজও অতীতের স্মৃতি ভুলতে না পারে অমনি ওপার বাংলার (বাংলাদেশের) সীমানা তর্জনী তুলে শাসন করবে। তবু নদী বয়ে চলেছে, দু-পারেই তার স্বাদ চোখের জলের মত নোনা, সাগরে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মোহানার এই দ্বীপগুলোতে জলপথ ছাড়া প্রবেশের আর কোন পথ নেই। ক্যানিংয়ের গোসাবা, হাসনাবাদের ইছামতী, কাকদ্বীপ ও ডায়মণ্ডহারবারের জলপথে নৌকা বা স্টীমারযোগে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে হয়। এ-ছাড়া নদী-সংলগ্ন সংকীর্ণ খাল বেয়েও সুন্দরবনের বড় নদীতে পৌঁছনো যায়। যথা—ধোসার হাটের খাল বেয়ে পিয়ালী নদী পেরিয়ে সুন্দরবনের মাতলা নদীতে পৌঁছানো যায়। চতুর্দিকেই শুধু জল আর জল। সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপারে দিগন্ত রেখায় পেন্সিলের সীসের মত আঁকা সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল যেমন সুন্দর তেমনি বন্য। প্রকৃতি-প্রেমী ও শিকারীদের স্বর্গভূমি, এত নরখাদক বাঘের সমাবেশ পৃথিবীর আর কোন জঙ্গলে নেই। কৌলীন্যে এরা—দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

কর্কটক্রান্তির ঠিক দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হল সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ, এর পরিমাপ দু' অঞ্চলেই প্রায় ১৬০০ বর্গমাইলের মত। বাইশটি ব্লকে এই অঞ্চলকে আবার দুটি রেঞ্জে ভাগ করা হয়েছে, নামখানা ও বসিরহাট রেঞ্জ। নামখানার প্রায় সব অঞ্চলটাই আবাদ অঞ্চল। কিন্তু বসিরহাট রেঞ্জ তা নয়। আবাদ অঞ্চল সামান্যই, বাকি সবটাই জনমানব-শূন্য বন্য-বাদা। দিগন্তরেখায় নিঃসঙ্গ, সৌন্দর্যে আত্মহারা বিভোর!

সুন্দরবনের যে-কোন নদী, ধরুন—মাতলা বা গোসাবা বেয়ে আপনি নির্ভয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। নির্ভয়ে! হ্যাঁ, নির্ভয়েই উঠে যাবেন, কারণ রাইফেলের ওপর আপনার যতই আস্থা থাক, দুঃসাহসে যখন বুক বেঁধেছেন অচেনাকে চিনতেই হবে। মনে রাখবেন, সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল দিনে দু'বার ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে যায়। উত্তরাঞ্চল থেকে সবেগে নেমে আসা তীব্র স্রোতের সঙ্গে এই

জোয়ারের জলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে, ফলে তীব্র জলোচ্ছ্বাস ঝাঁপিয়ে পড়ে শাখানদীগুলিতে। বড় বড় খাল আর পাশ-খালগুলো সেই বাড়তি জলে পুষ্ট হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। পরিণামে জোয়ারের সময় গোটা বাদা অঞ্চলই প্রায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক গাছপালা ডুবে যায়। জলের এই হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে দুটি কারণের উপর। প্রথমটি সমুদ্রের দূরত্ব ও দ্বিতীয়টি চাঁদের প্রভাব। ডুবে যাওয়া গাছের গোড়ায় জোয়ারের সময় জলের রেখার যে দাগ পড়ে সেই পর্যন্ত কোন পাতা জন্মায় না। জোয়ারের সময় উঠতে হয় আর ভাঁটার টানে নামতে হয়, এইভাবে বাদা অঞ্চলের মানুষের দিন কাটে। জোয়ার-ভাঁটার দেশ সুন্দরবনে নৌকা ছাড়া আর কোন সহজ যানবাহন নেই। সুন্দরবনের সব নদীই আবার নাব্য নয়, সুতরাং স্টীমার বা লঞ্চ বনের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে না।

এই বন্য দ্বীপগুলোতে স্থলপথের কোন চিহ্নই নেই, অসংখ্য খাল বিলে ভরা সুন্দরবন সবদিক থেকেই দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্যও বটে। দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কল্পনা অর্থহীন ছেলে-মানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়, এমন কি নিছক আত্ম-ঘাতী প্রয়াস বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। এ-হেন সুন্দরবনে প্রথমেই যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হল কাদা। কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া সর্বত্রই এই কাদা। সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার মত অসংখ্য খাল, পাশ-খাল আর নালা বনের পথ জুড়ে আছে। দুঃসাধ্য এ-বনে পথ চলা: জোয়ারের সময় খালগুলো উপচে পড়ে, কিন্তু ভাঁটার সময় জেগে ওঠে নোংরা কাদার রাজ্য। সূর্যের আলোয় রুপালী পাতের মত ঝক্‌মক্ করে ওঠে সেই কাদার স্রোত, তখন আবির্ভাব হয় তিন-চার ইঞ্চি লম্বা এক জাতের জলজ পোকার। অনেকটা ল্যাটা বা চ্যাং মাছের মত দেখতে, বাদার মানুষ বলে ডোগর, ডোগর মাছ—ওরা স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করে তখন নির্জন দ্বীপের সেই পালিশ করা কাদার স্রোতে।

গা ঘিন্ ঘিন্ করা নোংরা কাদা আর দিক্‌ভ্রমকারী অসংখ্য খাল

ও নালার সমস্যায় যখন বিহ্বল, যখন বন্য বর্বরতার স্বাদ সবে মাত্র গ্রহণ করতে মনস্থ করেছেন, ঠিক তখনই হয়তো আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সব থেকে রমণীয় ও সবচেয়ে বন্য অঞ্চল হিসেবে যার খ্যাতি শুনে এসেছেন—সেই অপরূপ সুন্দর-বনের বাসিন্দা দুঃসাহসী নরখাদক বাঘ হয়তো অদূরেই কোন মামুলি ঝোপের আড়ালে রঙে রং মিশিয়ে ওৎ পেতে রয়েছে। আপনি ঘূণাক্ষরেও যা টের পাবেন না।

তবু চাঁদনী রাত সুন্দরবনে যে মায়া-জাল বিস্তার করে তার কোন বর্ণনা নেই, তুলনা হয় না সেই অপরূপ সৌন্দর্যের। মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে, এত রূপ! আশ আর মিটতে চাইবে না—মনে হবে—হল না, মন ভরলো না, কিছুই দেখা হল না—সামান্য দুটি চোখে তার কতটুকুই বা ধরে রাখা যায়! নয়ন যখন কানায় কানায় পূর্ণ, তৃষিত-মন তখনও কাতর, শব্দহীন নৈশ-সৌন্দর্যে আপনি যখন স্তব্ধ, সেই পূর্ণক্ষণে যখন আপনার ভিতর বাহির একাকার হয়ে গেছে, তখন মনে হবে—কার অভিসারে এমন রমণীয় সাজে সেজেছে অরণ্য-প্রকৃতি! ভুবনে এমন চাঁদের হাট কে দেখেছে, কে শুনেছে নিশুতি রাতের এমন ঘুম-পাড়ানী গান···!

নৌকার গায়ে ভেঙ্গে পড়া ক্লান্ত ঢেউয়ের ছল্‌-ছল্‌ শব্দ, শান্ত নদীর জলে রুপালী চাঁদের প্রতিফলন ঢেউয়ের সংঘাতে যা মুহূর্তে-মুহূর্তে শতধা হয়ে যায়। সেই নদীর কূল-ঘেঁষা নীরব নিস্পন্দ ঘন বনের এক অব্যক্ত, অস্পষ্ট মৌন ইশারায় দুরন্ত আহ্বান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে রূপকথার রাজ্যে। কেড়ে নেবে চোখের যত ঘুম! শুধু সৌন্দর্য নয়—চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য অবশ্য আরও অনেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার আগে দেখুন সুন্দরবন! দু'চোখ ভরে দেখুন—সেই কবে, কত কাল পূর্বে সমুদ্রগর্ভ থেকে কি অসীম দুরাশায় মাথা তুলেছিল বন্য দ্বীপগুলো। কেমন করে নদ-নদী পলিমাটি ভরা অবিরাম স্রোতের সঙ্গে সমুদ্রের নোনা জলের মিশ্রণ ও সংঘর্ষের ফলে জমে ওঠা নতুন জাগা কর্দমাক্ত স্তর—সুন্দরবনের

ভাবী বীজ গর্ভে নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে ভাবীকালের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সূর্যের বন্দনা গেয়েছিল, সৃষ্টির সেই প্রথম দিনের মত—সে খবর আমার জানা নেই।

খেয়ালী প্রকৃতির অপূর্ব দান এই সুন্দরবন···! যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বন্য, ক্ষণে ক্ষণে এর রূপ বদলায়, নিষ্পলক দৃষ্টিতে উপভোগ করতে হয় সেই বন্য সৌন্দর্যকে।

অসংখ্য সুন্দরী গাছের প্রাচুর্যতার জন্যই হয়তো এ বনের নাম সুন্দরবন। কিন্তু বর্তমানে সুন্দরী গাছের যথেষ্ট অভাব, কদাচিৎ দু-একটা চোখে পড়ে। ঘন সবুজ কেওড়া, বাহারে খোরল পাতা, গরাণ, বাইন, গেপো, ভায়া, হেঁতাল ও অক্টোপাসের মত মাটি আঁকড়ে ধরা লম্বা লম্বা শিকড়ওয়ালা অপূর্ব ম্যানগ্রোভের সৌন্দর্যে এ বন নিঃসন্দেহে—সুন্দরবন! এখানকার সব খালে-বিলে দু'বেলা জোয়ার-ভাঁটা খেলে, খালে জোয়ারের উপচে ওঠা জলে বনের অঙ্গন যেন ধুয়ে মুছে দেয়। নোনা-মাটিতে বেশী আগাছাও জন্মায় না। বিখ্যাত সুন্দরী ও কেওড়া গাছই এ অঞ্চলের বড় গাছ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় অপর গাছগুলোকে নির্ভুল সারিবদ্ধভাবে কে যেন নিপুণ হাতে রোপণ করে গেছে। নয়নাভিরাম ঘন সবুজ পত্র-পল্লব নদী বা খালের ধার নিবিড় করে ঢেকে রেখেছে, আবার কোথাও জলের ধার থেকে সরে গেছে বন ভিতরের দিকে, তখন সেই নিঃস্ব তীর সূচের মত তীক্ষ্ণ সবুজ ঘাসে ভরে থাকে!

দেশ বিভাগের ফলে সুন্দরবনের সমৃদ্ধ অংশ বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সবটুকুই পড়েছে বাংলাদেশের অংশে। সমুদ্র উপকূলবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বনজ সম্পদ বলতে বিশেষ কিছু নেই। এই অঞ্চলে নতুন করে আর গোলপাতার চাষ হয় না, আগেকার দিনে ঘর ছাওয়ার কাজে গোলপাতার ব্যবহার হত। ইদানীং কদাচিৎ চোখে পড়বে গোলপাতার বাহার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।

ক্ষুরধার নদীর তাণ্ডব লীলায় আর বর্ষার দাপটে ক্রমাগত দ্বীপের পাড় ভেঙে পড়ে, সৃষ্টি হয় উর্বর পলিমাটি ভরা নব নব ক্ষুদ্র বড়

দ্বীপের। ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় সুন্দরবনের নিত্য নবরূপ, গত বছর যা দেখে এসেছেন এ বছরে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা আর বর্ষার প্লাবনে মানচিত্রের আঁকা রেখাগুলোকে নিমেষে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে চলেছে খেয়ালী প্রকৃতি। জল-জঙ্গলময় সুন্দরবন যেন এক চলমান অরণ্য!

ভাদ্রমাসের কোটালে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এ বন, তখন পুরো অঞ্চলটাই প্রায় ডুবে যায় জলের তলায়, শুধু জেগে থাকে বড় বড় গাছের মাথা এখানে ওখানে। তীব্র লড়াই করে ঘোষণা করতে হয় ডাঙ্গার অস্তিত্ব। তখন বনের যত সাপ আর পোকা-মাকড় সেই উঁচু ডালে এসে আশ্রয় নেয়। ভরা কোটালের সময় দ্বীপের উঁচু অংশগুলোই শুধু জেগে থাকে। তখন সেখানে এসে জড় হয় বনের যত প্রাণী। উত্তাল তরঙ্গময় অসীম জলরাশির সেই ভয়ঙ্কর সংহার মূর্তি দেখে ওরা খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ পর্যন্ত ভুলে যায়। ভুলে যায় হিংসা, ক্রোধ আর অন্য রিপুগুলোকে। সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতল হরিণ আর দাঁতাল বরা একই আশ্রয়ে অসহায়ভাবে দেখে তীব্র স্রোতের মরণ-ঘূর্ণী। তখন গাছের শীর্ষ ডালে বসে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে বানরের দল। সেই ভয়ঙ্কর অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে সভয়ে চোখে হাত চাপা দেয়, কখন কখন কুঁই-কুঁই করে ভয়ার্ত শব্দ করে ফেলে। তারপর, এক সময় জল কমে যায়, তখন বনের প্রাণীরা যে যার ঠিকানায় দ্রুত গা ঢাকা দেয়। ধীরে ধীরে আবার জেগে ওঠে সুন্দরবন—তেমনি ভয়াল, ভয়ঙ্কর, সুন্দর!

এ-হেন সুন্দরবনের বাসিন্দা পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হিংস্রতায় যার জুড়ি নেই, এমন ব্যাপক একচেটে নরখাদকের আড্ডা আর কোথাও নেই। হলদে-কালো ডোরা-কাটা বিশাল দেহখানা ঝোপের আড়ালে আড়ালে যখন নিঃশব্দে চুপিসাড়ে হাঁটে, তখন বনে যে সাড়া পড়ে যায়, তার তুলনা মেলা ভার। প্রহরী প্রাণীরা তীব্র স্বরে ঘোষণা করে আতঙ্ক ভরা সঙ্কেতের ধ্বনি। গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে চিৎকার শুরু করে দেয় বানরের দল, বনো

শূয়োর প্রাণভয়ে দৌড়তে থাকে, একটানা ভয়ার্ত ডাক ডাকতে থাকে নিরীহ হরিণ আর ব্যাঁ-ব্যাঁ করে চক্রাকারে ওড়ে সুন্দরবনের মাছ-ধরা পাখী লম্বা ঠোঁট-ওলা উত্তেজিত সলুই। এইভাবে যখন ওরা দলগত সম্বর্ধনা জানায় বা আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন বনের রাজা কখন নিঃশব্দে গা ঢাকা দেয়, আবার কখন মর্জি-মাফিক্ একটা চাপা হুঙ্কারে সব হট্টগোল নিমেষে স্তব্ধ করে দেয়। হাঁড়ির মত মস্ত মুখ-মণ্ডল থেকে যে শব্দ নির্গত হয়, তা যেমন গম্ভীর তেমনি দূরপ্রসারী। মাটি কাঁপে, গাছের পাকা পাতা ঝরে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি কখন স্তব্ধ কখনও বা শত গুণ বেড়ে যায়, ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হিম-স্রোত নেমে আসে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে, বেতস পাতার মত কম্পমান দেহে এমন চলচ্ছক্তি আর থাকে না। মৃত্যুর পদধ্বনি এগিয়ে আসতে থাকে।

রৌদ্র-ছায়ায় ঢলঢলে মসৃণ চামড়ার অন্তরালে সুদৃঢ় মাংসপেশীতে যে ঢেউ খেলে, তা দেখে পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটিয়সীও লজ্জা পাবেন। বাঘের চলা এক অপূর্ব ছন্দময়, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে। অনেকে বলে কোমর ভাঙ্গা, বন-বিবি নাকি হেঁতালের লাঠি মেরে কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। বাঘ যখন শিকারের সন্ধান পায় তখন ল্যাজের অগ্রভাগ দৃঢ় হয়ে বেঁকে যায় এবং তাতে দোলা লেগে আক্রমণের সূচনা করে। অত্যন্ত ধূর্ত নরখাদকরা যখন চোরের মত বনের আড়ালে লুকোচুরি খেলে, তখন এক মারাত্মক মতলব লুকিয়ে থাকে সেই সন্তর্পণে চলা-ফেরার মধ্যে। অভিজ্ঞ শিকারীরা নরখাদককে ঠিকই চিনতে পারেন তাদের গোপন অভিসন্ধি ও চোরের মত হাবভাব দেখে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সুন্দরবনের বাঘেরাও মানুষ চেনে, কোন মানুষ তার শিকার আর কোন মানুষ বিপজ্জনক। তবে কোন ক্ষেত্রেই তার শিকার-কৌশলের কোন হেরফের হয় না। মানুষ ধরবার সময়ও সে বাতাসের বিপরীত দিক থেকেই অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে অপেক্ষা করে থাকে তখন কোনমতেই বিশ্বাস হবে না ওই সামান্য আড়ালে পাথরের মত অনড় হয়ে সে

অপেক্ষা করেছিল। ধৈর্যের মেলায় এত দীর্ঘ সময় সে নিঃশব্দে থাকতে পারে যে প্রাণী জগতে বিরল।

এ-হেন নরখাদক আবার অসামান্য শক্তির অধিকারী, মৃতদেহ মুখে ঝুলিয়ে ছোট-খাট খাল-নালা অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যায়। দুর্গম পাহাড়ে চড়তেও তার ক্লান্তি নেই।

সুন্দরবনের দুর্গম বাদার প্রতেকটি দ্বীপেই নরখাদকের বাস, সময় সময় বাম দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাতায়াত করে। কখন সঙ্গীর সন্ধানে আবার কখন খাদ্যের সন্ধানে। একই দ্বীপে দুই কিংবা ততোধিক বাঘ ও বাঘিনীর সংখ্যা কিছু আশ্চর্যের নয়, যদিও বাঘ দলবদ্ধ প্রাণী নয় সে চির-নিঃসঙ্গ, একক। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাঘেদের মৈথুন ঋতু, এর ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। সেই সময় বাঘ সঙ্গীর সন্ধানে ছুটে বেড়ায় আর গভীর ডাক ছাড়ে। যদি সঙ্গিনীর সাড়া পায় তখন যে ডাক পাঠায় তার তলব অত্যন্ত জরুরী। প্রয়োজনে সাঁতার দিতেও সে পেছপা নয়। জেনে রাখা ভাল, সুন্দরবনের বাঘ সাঁতারে অত্যন্ত দক্ষ। তীব্র স্রোতের মধ্যেও সে এতটুকু লক্ষ্যচ্যুত হয় না, চিহ্নিত জায়গায় সোজা সাঁতার দিয়ে ওঠে। এতটুকু বে-হিসেবী কাজ বোধ হয় তার ধাতে সয় না। এমন কি গুলি খাওয়া বা শিকারে ব্যর্থ হওয়া বাঘ নিজের অবাধ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পর্যন্ত কামড়ে শাসন করে।

নিশুতি রাতে নদীর ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দিয়ে নিঃশব্দে নৌকা থেকে ঘুমন্ত মানুষ তুলে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে জঙ্গলে ফিরে আসাই সুন্দরবনের বাঘেদের চরম দুঃসাহসিক খেলা। এ খেলার জয়-গৌরবে তার সাহস যেমন বেড়েছে তেমনি নামও কিনেছে প্রচুর। তখনকার দিনে সংবাদপত্রের পাতায় এমন দিন খুব কমই গেছে, বাঘের দুঃসাহসিক কীর্তির কথা লেখা হয়নি।

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বাঘ লঞ্চ পর্যন্ত আক্রমণ করে বসে, সে তুলনায় জেলে-ডিঙ্গি বা দেশী নৌকো নিতান্তই মামুলী। একবার বনবিভাগের একটা লঞ্চ রাত কাটাবার জন্য মাঝ নদীতে নোঙ্গর ফেলেছিল।

ক্ষুধার্ত বাঘটা টহল দেওয়ার সময় লঞ্চটা দেখতে পায়, লঞ্চের ওপর মানুষ দেখে সে অপেক্ষা করতে শুরু করে। বাঘটা গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। বে-পট্ জায়গায় এসে রাত কাটাতে হচ্ছিল বলে লঞ্চের আরোহীদের চোখে ঘুম আসছিল না। কেমন করে না জানি বাঘটা টের পেয়েছিল রাত্রির ঠিক সেই প্রহরে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, ধীরে ধীরে সে সাঁতার দিতে শুরু করলো। উঁচু লঞ্চে ওঠবার কোন পথ ছিল না, শেষে পায়খানার ধারে একটা কাঠ বেরিয়েছিল, বাঘটা সেই কাঠের ওপর থাবার ভর রেখে ওপরে উঠে পড়লো এবং ধূর্ত শিকারীর মত পায়খানার আড়ালে বসে শব্দ শোনবার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময় একজনের পায়খানা যাবার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় দরজা খুলে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো, তারপর অসাবধানে টর্চের বোতামে আঙ্গুল পড়তেই এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল সোজা বাঘটার ওপর। তৎপর বন-কর্মচারী বিদ্যুৎ-গতিতে দরজার আড়ালে চলে গেল, স-শব্দে দরজা বন্ধ হল, তারপর কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলো—বাঘ, বাঘ।

দেশী নৌকো হলে কোন ভাবনা ছিল না, সহজেই তার শিকার জুটে যেত, কিন্তু লঞ্চের দরজা যথেষ্ট মজবুত। বাঘটা রাগে ফুঁস্‌তে ফুঁস্‌তে এসে দরজা আঁচড়ালো, তারপর কয়েকবার পায়চারি করে যখন দেখলো কেউ ফাঁকায় এল না, তখন জলে নেমে সাঁতার দিতে লাগলো।

আর একবার একটা বাঘ 'ছোটা হরদি'র গাঙ্গে একটা হাউস বোটে উঠে পড়েছিল। বোটের আরোহীরা সেই সময় তীরে নেমেছিল জঙ্গলের কাজে। অনেক বেলায় কাজকর্ম চুকিয়ে ডিঙ্গিতে চড়লো হাউস বোটে পৌঁছানোর জন্য। এমন সময় দলের একজন দৈবাৎ দেখতে পেলো বোটের ওপর একটা বাঘ লুকিয়ে বসে রয়েছে। তখন বেলা দুপুর, খিদেয় নাড়ী জ্বলছিল, কিন্তু বাঘ দেখেই ডিঙ্গির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল আর সেই সঙ্গে শুরু হল পরিত্রাহি চিৎকার। তবু বাঘটা ভয় পেল না, তখন ইনচার্জ ভদ্রলোক বন্দুক বার করে ফাঁকা

আওয়াজ করতেই বাঘটা জলে নেমে পড়লো। পাছে ডিঙ্গি আক্রমণ করে বসে সেই ভয়ে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে তাকে বনের অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

সুন্দরবনে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। ঘটনাগুলো এমনই গা-সওয়া হয়ে গেছে যে, এ-নিয়ে কেউ তেমন মাথাও ঘামায় না। এ অঞ্চলে লোকের দুর্দশার আর অন্ত নেই—কাঠ, মাছ, মধু সংগ্রহে বাঘের সামনে তাদের আসতেই হয়। তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, নরখাদকরা শিকারীর নৌকো ঠিক চিনতে পারে এবং তাদের সে হিসেবে কখন কোন ভুল হয়নি। তবু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বাঘ পাতার আড়ালে বসে লক্ষ্য করে এবং পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূলে না আসা পর্যন্ত কিছুতেই ঝুঁকি নেয় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থেকে তারা জেনেছে যে, জেলে-মাঝিদের তুলনায় বিচিত্র পোষাক পরা বন্দুকধারী নড়বড়ে মানুষগুলো তাদের সহজ শিকার নয়, তাই নিরস্ত্র জেলে, কাঠুরে আর মৌলীরাই তার সহজ শিকার। মানুষ শিকারে ছোটাছুটির প্রয়োজন নেই, এ শুধু বুদ্ধি ও ধৈর্যের খেলা, তাই দ্রুত গতি থাকার তৎপরতা ছেড়ে ধূর্তমীর খেলায় সে এত পারদর্শী। এতক্ষণে হয়তো আপনি কিছুটা আন্দাজ পাচ্ছেন যে, আপনার নৌকো থেকে দেখা দু-পাশের নিবিড় সবুজ বন যতই মনোরম হোক না কেন, অন্তরে তার রয়েছে এক গভীর ক্ষুধা।

বনের সব দ্বীপেই প্রচুর চিতল হরিণ দেখা যায়, যদিও এদের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়, সরকার আইন করে হরিণ মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল বাঘেদের স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে। তবুও নরমাংসলোভী বাঘ প্রতিটি দ্বীপে উড়িয়ে দিয়েছে তার জিঘাংসার নিশানা।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাঘের গতি এখানে অব্যাহত নয়, ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় অবাধে ছড়িয়ে পড়ে ইচ্ছামত শিকার সংগ্রহ করতে পারে না। নদী, খাল ও বিলে ঘেরা খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ডের সীমাবদ্ধ বাঘ দ্বীপের হরিণ ও বরা শিকার করেই উদর পূর্তি করতে বাধ্য হয়। জনশ্রুতি আছে, সুন্দরবনের বাঘ নাকি মাছ ও কাঁকড়া

ধরে খায়। বাঘের ও স্থানীয় চোরা-শিকারীদের অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে পড়ে, তখন ভীত, বিহ্বল হরিণের পাল দলে দলে দ্বীপ ত্যাগ করে নিরাপদ কোন স্থানে চলে যায়। ফলে বাঘের স্বাভাবিক শিকারে ঘাটতি পড়ে, তখন বাধ্য (!) হয়ে তাকে নদী বা খালের নির্জন চরে এসে বার বার ঘোরা-ফেরা করতে হয়। উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতে হয় কতক্ষণে শুনতে পাবে মনুষ্য কণ্ঠ-স্বর, শুনতে পাবে কাঠকাটার মধুর শব্দ, জাল ফেলার মিষ্টি জলতরঙ্গ। বাঘ সাঁতারে দক্ষ হলেও বড় বড় জলপথ সহজে পাড়ি দিতে চায় না, সঙ্কীর্ণ খাল পারাপার করে, ক্ষুধার জ্বালায় খালের চরে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ওৎ পেতে থাকে।

বনের আর এক বিস্ময় দাঁতাল বরা। বাঘের হুঙ্কার শুনে হরিণের পাল মুহূর্তে অদৃশ্য হবে, শূয়োরের পাল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে! কিন্তু ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে 'রণং দেহি' বলে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে সর্দার দাঁতাল বরা! বনের অপরাজেয় বীর, আমরণ লড়াই করবে তবু পেছু হটবে না। তখন গাছের ডালে উত্তেজিত বানরের চিৎকার শোনা যাবে। ডাল ঝাঁপিয়ে উৎসাহ যোগাবে সেই উত্তেজনা-পূর্ণ অসম-লড়াইয়ের।

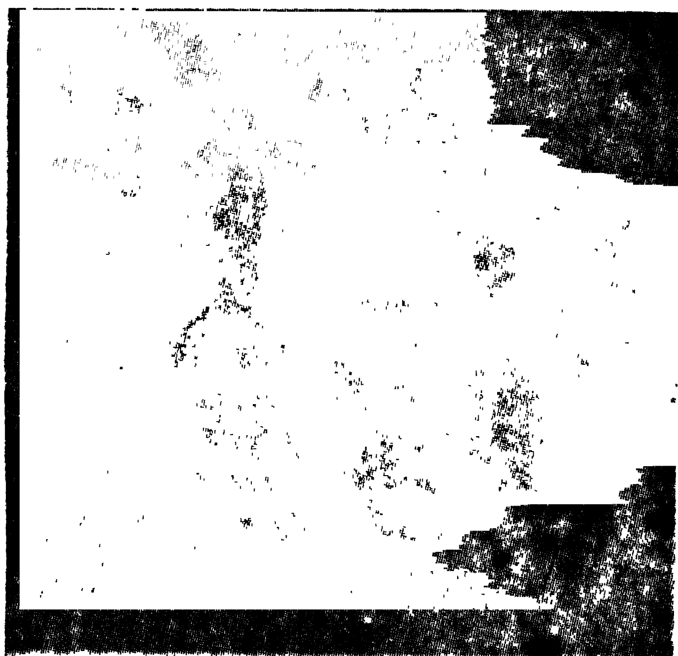
সুন্দরবনের আর এক ভয়াবহ প্রাণী বিষধর সাপ। এরা প্রধানতঃ গোখরো কেউটে ও শিয়র-চাঁদা। শীতকালে গাছের কোটরে আশ্রয় নেয়, কখন গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে দোল খায়। বড় নদীর চড়ায় কাদা-মাখা কুমীরকে রোদ পোহাতে দেখা যায়, সুন্দরবনে কুমীরের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। তবে, জলের সর্বত্র—এমন কি ছোট খালেও অসংখ্য 'কামট' ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনের ডাঙ্গা, জল এমন কি বড় গাছও নিরাপদ নয়।

সুন্দরবন যেমন ভয়ানক বন্য-বর্বর, তেমনি অফুরন্ত সৌন্দর্যময়। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে আপনার অবসাদ-বিনোদনের জন্য রয়েছে 'পাখিরালয়' (Birnd Santuary), সজনেখালী বন-দপ্তরের অনতি-দূরেই এর অবস্থিতি। আপনি এখানে দুর্লভ 'পেলিক্যান' দেখতে পাবেন, সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য আছে। লোথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে

দ্বীপ ও সজনেখালী। বর্তমানে সুন্দরবনেও ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু হয়েছে, সেই সঙ্গে যদি ঠিকমত প্ল্যান্টেশন করা যায় বা পরীক্ষা-মূলকভাবে অন্যান্য জাতের গাছপালা লাগানো সম্ভব হয়, যাতে পাখীর খাদ্য ও বাসা বাঁধবার উপযোগী নিরাপদ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বিভিন্ন জাতের কত সুন্দর সুন্দর স্থানীয় ও যাযাবর পাখী এসে বাসা বাঁধতে পারবে। বসবাসকারী সেই সব পাখীর কাকলিতে মুখর হয়ে উঠবে সুন্দরবন। এক সময় সুন্দরবনে বন্য মহিষ ও গণ্ডারের বাস ছিল, সে কথা আজ আর কল্পনাও করা যায় না।

সুন্দরবনের আর এক বিশেষত্ব হচ্ছে—'শুলো'। এ অঞ্চলের প্রায় সব গাছই শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্য মাটির তলা থেকে শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়গুলোকে মাটির ওপর তুলে দেয়। শিকড়ের সরু মুখগুলো কখন আলাদাভাবে কখন বা একসঙ্গে অনেকগুলো গজিয়ে ওঠে। ঝড়-ঝাপ্টা আর রৌদ্রের তেজ লেগে লেগে শিকড়গুলো ক্রমশই শক্ত ও সূচলো হয়ে ওঠে। লম্বায় এক-একটা দু' ইঞ্চি থেকে দু' ফুট আড়াই ফুট পর্যন্ত হয়, আর সেই অনুপাতে মোটাও হয় তেমনি। সুতরাং সুন্দরবনে সহজ প্রবেশাধিকার কোথাও নেই। মাটি শুলোয় শুলোয় কণ্টকিত, এদের ঠিক ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে পথ চলতে হয়, অন্যমনস্ক হলেই সূচলো শুলোয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে পদে। এক নজরে মনে হবে যেন ভীষ্মের শর-শয্যা পাতা আছে। সুন্দরবনের জলপথও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর, পথ হারানোর আতঙ্ক সব সময়ই থেকে যায়। প্রায়ই দেখবেন জলের শিরা বিপরীতমুখী, এর কারণ—সঙ্কীর্ণ খালগুলোর উভয় মুখই বড় নদীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় জোয়ার ও ভাঁটার সময় জলের উর্ধ্ব ও নিম্ন চাপের দরুনই এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে থাকে। জোয়ারের সময় উভয় মুখ দিয়েই জল প্রবেশ করে, আবার ভাঁটার সময় দু-মুখ দিয়েই জল নেমে যায়। সেই সময়ই স্পষ্ট বোঝা যায় জলের এক ধার দিয়ে একটা স্রোত প্রবেশ করছে, অপর ধার দিয়ে আর একটা স্রোত বিপরীত মুখে নেমে যাচ্ছে।

সুন্দরবনকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, আবাদ অঞ্চল আর বাদা-অঞ্চল। আমার এ কাহিনী বাদা-অঞ্চল নিয়ে। পশ্চিমের আবাদ অঞ্চল মিষ্টি-জলের এলাকা, জনপদ সমৃদ্ধ। নদীর পূর্বাংশে লোকালয়-হীন বন্য বাদা-অঞ্চল, নোনা-জলের এলাকা—দুর্গম বিপদসঙ্কুল। অসম্ভব কাদা ও শুলোর রাজ্য, ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। গাছে বিষধর কেউটে, ডাঙ্গায় নরখাদক বাঘ আর জলপথ কুমীর-কামটে



ভর্তি। এ-হেন নোনা-বাদা মানুষকে সব ঋতুতে বরদাস্ত করতে পারে না, তাই তার দ্বার ছ'মাস থাকে রুদ্ধ। তবু অসম-সাহসী মানুষ অতীতের কোন এক সময় এই বন্য-বাদাকে জয় করবার জন্য বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে প্রয়াস ছিল খেয়ালী প্রকৃতির কাছে নেহাত-ই অকিঞ্চিৎকর। তাই সামান্য খড়-কুটোর মতই কবে ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গাঙ্গেয় দুরন্ত স্রোতে। বাদার তলায় কত পুরনো চিহ্ন, কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস নিয়ে হয়তো আজও

চাপা পড়ে আছে, কত জোয়ার-ভাঁটা বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে—কে তার হিসাব রাখে…। শোনা যায় জল-দস্যুদের আমলে সুন্দরবনের মাটিতে অনেক ধন-রত্ন গোপনে পুঁতে রাখা হয়েছিল। একবার এক জেলে একটা মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল, আর এক কাঠুরে পেয়েছিল একটা গিনি।

শীতের দিনে সুন্দরবন কিন্তু ভারি শান্ত, কেমন উদাস-উদাস মনে হয়। কেমন যেন নির্লিপ্ত। বেলা শেষের সোনালী আলোয় নদীর মালায় ঘেরা সুন্দরবন সবুজ পান্নার মত জ্বল-জ্বল করে ওঠে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে আসা অসংখ্য ঝিনুক ও শামুকের খোলের পাশ দিয়ে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চলে দলে দলে লাল কাঁকড়ার সারি। ওদের ব্যস্ততা বা সারিবদ্ধভাবে চলা দেখে মনে হয় যেন ক্লাইভের আমলের গোরা-পল্টনের মত মার্চ করে চলেছে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করতে। ভেসে আসা কাঠ-কুটো জমা হয়ে রয়েছে স্তূপাকারে এখানে ওখানে, নোনা জলে পচে পচে কালো বিকৃত ওদের চেহারা। বায়ু-তাড়িত বালির স্তূপ ঢেউ খেলানো, সেখানে অভ্রের চূর্ণ সূর্যালোকে চিক্-চিক্ করছে। নোনা জলে জ'রে যাওয়া কত বিচিত্র বর্ণের ভেসে আসা পাতা দ্বীপের কিনারা মালার মত ঘিরে রাখে। দূর থেকে মনে হয় যেন একখানা বহু মূল্যবান বিচিত্র বর্ণের পাথর সেটিং করা অমূল্য হার অবহেলায় পড়ে রয়েছে।

সূর্য অস্ত গেলেই বনের হরিণরা দল বেঁধে সেই পাতার মালা খেতে আসবে, অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ওদের। হরিণের দল যখন ফাঁকায় এসে লাফালাফি করে খেলা করবে, বুক ভরে সমুদ্রের বাতাস নেবে, তখন অন্ধকার নেমে এসে ঝোপের তলাগুলোকে আড়াল করে ফেলে। আকাশের তারারা সবে অবাক হয়ে চোখ মেলেছে, বাতাস লেগে নদীর ঢেউ যখন ফুলছে, ঠিক তখনই মাটিতে পেট ঘষে ঘষে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে আগুন-ঝরা এক জোড়া চোখ। হ্যাঁ, ক্ষুধিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনের আতঙ্ক, বিভীষিকা—সুন্দরবনের গর্ব!

অক্টোবর থেকে মার্চ—এই ছয় মাসই শান্ত সুন্দরবন সভ্য দুনিয়ার সব অত্যাচার সহ্য করে। তখন দলে দলে আসে কাঠুরেদের নৌকো। মস্ত বড় সেসব নৌকো, তার বিশাল খোল দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়, মনে হয় গোটা বনটাই বুঝি ওর পেটে ঢুকে যাবে। তারপর আসে জেলে নৌকো, কাঁকড়া ধরার ডিঙ্গি, আর সব শেষে আসে মধুয়ালরা। শান্ত নদীর জলে ওরা বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় বায়, কেউ পাড়ি দেয় একদিনের পথ—আবার কেউ পাড়ি দেয় দেড়-দিন দুদিনের পথ। জীবিকার তাড়নায় ওরা বাদায় আসে, বাদার গাঙ্গে মন খুলে গান গায়, ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকে মস্ত মস্ত পালতোলা নৌকোগুলো। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা-কষা জীবনের এমন বলিষ্ঠ চেহারা আর কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনি।

মরশুমের কাজ শুরু হয়ে যায়, বাদার মানুষ আবার দু-মাসের মত কর্ম-ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাড়া পড়ে যায় বনের প্রাণীদের মধ্যেও, যেন দীর্ঘকাল পরে বাদার ঘুম ভাঙ্গলো। কাদা-মাখা অলস কুমীর নেমে যায় জলে, সদা-সতর্ক হরিণরা নাক ফুলিয়ে ঘ্রাণ নেয়—কান ঘুরিয়ে শব্দ শোনে। আর বনের সব থেকে পুরনো বাসিন্দা বানরের দল গাছের ডালে দোল খায়, খক্ খক্ করে কেশে বয়স্ক অভিভাবকের মত অসতর্ক হরিণদের ধমকায়। বানরের সঙ্গে হরিণের খুব ভাব। কখন কখন ওদের পিঠে চেপে কর্দমাক্ত নালা পারাপার করে, বিনিময়ে গাছ কাঁপিয়ে পাতা খাওয়ায়, পাহারা দেয়। বিপদ দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে কিচ্ কিচ্ করে শব্দ করে, তবু বানরের মিষ্টি ডাক কি কখনও শুনেছেন! ভোর-বেলা যদি চুপিসাড়ে নদীর ধারে আসেন তো শুনতে পাবেন সেই ডাক। তখনো সূর্যোদয় হয়নি, পাখীরা সবে ডানা মেলেছে, শান্ত নির্জন নদী-তীরের কোন সু-উচ্চ ডালে বসে আপন মনে সে ডাকে। ভোরের বাতাসে ভেসে আসা সেই নরম সুরেলা ডাক আপনাকে মোহিত করে দেবে। ভেবে অবাক হবেন, বানর এত সুন্দর ডাকতে পারে!

মানুষের কণ্ঠস্বর আবার ছড়িয়ে পড়ে বনে বনে। আর সেই শব্দ

শুনে আলোড়ন উঠে হেঁতাল ও গোলপাতার বনে। এ সেই চাঁদ-সদাগরের হেঁতাল, যে হেঁতালের লাঠি হাতে চাঁদসদাগর লখীন্দরের লৌহবাসর পাহারা দিয়েছিল। অনেকটা ছোট খেজুর গাছের মত দেখতে, বাঘ এর ছায়ায় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে প্রতীক্ষা করে। গর্তগুলো অনেকটা ডোঙ্গার মত লম্বাটে, প্রায় হাতখানেক গভীর। যখন মানুষ বনে নামে তখন এই হেঁতাল ও গোলপাতার বনে এমনি আলোড়ন ওঠে, দৃষ্টির তীক্ষ্নতা শতগুণ বেড়ে যায় আর কর্কশ তীক্ষ্ণ কাঁটা ভরা জিভে লালা ঝরে।

তখন পুরোদমে মরশুমের কাজ শুরু হয়ে যায়। কাঁকড়া ধরার হাস্যকর সরঞ্জাম জলে নামিয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে ডিঙ্গিগুলো। আবার কোথাও মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুর্ণীজাল ফেলার শব্দ হয়। টানা জালের বেড় দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খায় জেলে-নৌকোর মাঝিরা। আবার কোথাও শব্দ ওঠে ঠক্‌ঠক করে বনে কাঠকাটার। সকলেই চকিত-চঞ্চল, সন্ত্রস্ত, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে বেলা শেষের আগেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফিরে যেতে হবে নৌকোয়, আর তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে ফেলতে হবে নৌকোর নোঙ্গর। যত বেলা যায়, গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়, ততই কেমন একটা আতঙ্কিত ভাব ফুটে ওঠে। তখন বাঘ-তাড়ানো সরকারি পটকা ফাটায় ঘন ঘন (এ-তে বিপদ কিন্তু আরও বেড়ে যায়, সুন্দরবনের ধূর্ত, অভিজ্ঞ নরখাদক বাঘেরা জানে যেখানে পটকার শব্দ সেখানেই রয়েছে তার শিকার, নিরস্ত্র কাঠুরে কিম্বা মৌলী, অতএব…) আর উৎকণ্ঠায় হাঁক পাড়ে, মা মা বলে ডাকে বনবিবিকে। বনে নামার পূর্বেই অবশ্য বনবিবির পূজো দেওয়ার রীতি এবং তা যথা-নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করা হয়, তবু তো নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না— কি একটা অশুভ ছায়া চোখের পাতায় যেন নেচে বেড়ায়। বনের ঋণ শোধ হয়নি, যেন কার পাওনা আজও দেওয়া হয়নি।

সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে বনবিবির অনেক মন্দির ছড়িয়ে আছে। খড়ে ছাওয়া উঁচু ঢিপির ধারে হরিণের পায়ের খুরের দাগ দেখতে

পাওয়া যায়, আর সেই চিহ্নের ওপর দিয়ে বাঘের থাবা চলে গেছে ভক্তরা মোরগ মানত করে, সেই মোরগ বা মুরগী কেউ ধরে না ব' মারে না, পাছে অমঙ্গল হয়—বনবিবি রুষ্ট হন। এইভাবে সুন্দরবনের জঙ্গলে বন-মোরগের চল্ হয়েছে। বনের সম্পদ আহরণে এসে ওরা বনবিবিকে তুষ্ট করে, প্রাণভিক্ষা চায়। তবু ললাটের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। ওদের সঙ্গে বাওয়ালী থাকে, তারাও পারে না—যদিও বাওয়ালীরা বনবিবির মন্ত্রপুত্র। বনের বিপদ আপদ ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা ওদের আছে অন্ততঃ এই রকমই সকলের বিশ্বাস। যখন কোন মানুষ বাঘের কবলে পড়ে তখন এই বাওয়ালীরাই মাত্র একখানা দা সম্বল করে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ থেকে মৃতদেহ ছিনিয়ে আনে। মন্ত্রশক্তির কথা বিশ্বাস না করলেও বাওয়ালীরা কোথা থেকে এত সাহস পায় ভেবে অবাক হতে হয়।

আমি এ-কালের অনেক বাওয়ালী দেখেছি, তারা যথেষ্ট সাহসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্ত্র-তন্ত্রের উপর যতই বিশ্বাস ও আস্থা থাক, আমি দেখেছি বাঘের দেখা পেলে বাওয়ালীরাও সাধারণ মানুষের মত গাছে উঠে প্রাণ বাঁচায়। তা সত্ত্বেও বাওয়ালীদের গুণাগুণ কোন অংশেই খাটো করে দেখতে বলছি না। এরা বনবিবি ও দক্ষিণ-রায়ের কাহিনী জানে এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, এই বিশ্বাসই হল বড় কথা। তবু ললাটের লিখন খণ্ডান আর কোন থাবায় কার নাম লেখা আছে, এর যাচাই করতে সুন্দরবনের মাটিতে কেউ কারুর ওপর নির্ভর করে না, এমন কি বাওয়ালীদের ওপরও না। আপদ-কালে সবাই ভাবে—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। তবু বনের কুসংস্কার-গুলো আজও বেঁচে আছে, যদিও বাওয়ালীদের সে দিনকাল আর নেই। একালের বাওয়ালীরা গ্রাম্য হেকিমও বটে।

আগেকার দিনে বাওয়ালীরা কত শক্তিমান ছিল সে সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। জানা নেই ঘটনাটি কতদূর সত্য, কারণ যে সময়ে সেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছিল তখন আমার জন্মই হয়নি। লোক-পরম্পরায় সেই অসাধারণ কাহিনী আজও বাদা-অঞ্চলে চালু রয়েছে।

তখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছে, কলকাতা পুলিশের এক বড়-কর্তার শিকারের সখ ছিল। সাহেব অন্যান্য বনে বাঘ মারলেও সুন্দরবনে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। সেই সময় বাওয়ালীদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের খবর তাঁর কানে আসে। বিশ্বাস না করলেও সাহেব ব্যাপারটার ওপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন স্থির করলেন। ব্যবস্থামত খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে সাহেব বাওয়ালীর কাছে গিয়ে পৌছলেন, কিন্তু বাওয়ালী শিকারে রাজী হল না। জেদ ধরলো সাহেবকে বাঘ দেখাবে কিন্তু গুলি করা চলবে না। অগত্যা রাজী হতে হল সাহেবকে।

তারপর সুন্দরবনের এর গভীর অঞ্চলে পৌঁছে বাওয়ালী সাহেবকে এক জায়গায় বসতে বললো, তারপর হাতখানেক লম্বা এক অদ্ভুত ধরনের লাঠি দিয়ে সাহেবের চতুর্দিকে গণ্ডি কেটে দিল। সাহেব মাটিতে বসে সেই ছেলে-খেলা দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন, কিন্তু সেই কৌতুক-বোধকে আর বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না। বাওয়ালী তাঁর রাইফেল, পিস্তল কেড়ে নিয়ে গণ্ডির বাইরে রেখে বললো, স্থির হয়ে বসে থাকুন বাঘ আসবে। বাওয়ালীও অবশ্য তাঁর পাশে গণ্ডির মধ্যেই রইলো। তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল, নীরব নিস্পন্দ বন, কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই, শুধু নির্জন চরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ফিস্‌ফিসানি ভেসে আসছিল ছলাৎ-ছলাৎ···। বাঘ আর আসে না, তখন বেলা বারোটা, নোনা-মাটিতে রোদ ঠিক্‌রে পড়ছিল। সাহেবের অস্বস্তি ক্রমে বেড়ে চলেছে, কিন্তু পিস্তল-রাইফেলও হাতছাড়া। এমন সময় বাওয়ালীর দিকে নজর পড়লো, দেখলেন বাওয়ালী জঙ্গলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ক্রমে মুখের চেহারা বদলে গেল, চোখের কোণে রক্তের ছিটে দেখা দিল। গলার শিরা ফুলে ফুলে উঠেছিল, হাতখানেক লম্বা সেই অদ্ভুত লাঠিটা মাটিতে তিনবার করে ঠোকে আর বিড় বিড় করে কি মন্ত্র আওড়ায়।

সাহেবকে চমকে দিয়ে বাওয়ালী হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লো, তারপর

সেই অদ্ভুত লাঠিটা প্রসারিত করে ডেকে উঠলো, আয়-আয়। ক্রমে সেই সুর চড়া পর্দায় উঠতে লাগলো, বাওয়ালীর সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কি এক আবেগে কাঁপছিল। এমন সময় অনেক দূর থেকে বাঘের ডাক ভেসে এল। সাহেব অবাক হয়ে বাওয়ালীর কাণ্ড দেখছিলেন, বাঘের ডাক কানে আসতেই রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালেন। ডাকটা ক্রমশই এগিয়ে আসছিল। বাওয়ালী সাহেবের হাতটা ধরে শান্ত চোখে তাকাল, মৃদু হেসে বললো, ভয় কি সাহেব, গণ্ডির মধ্যে যমও আসতে পারবে না। বাওয়ালী আবার ডাকলো, আয়-আয়। যেন কত চেনা, আপন জনকে ডাকছে, আয় কাছে আয়। আদরে-সোহাগে কণ্ঠস্বর যেন বুজে আসছিল।

এমন সময় জঙ্গলের ধারে শব্দ হল। কে যেন ডাল-পালা ভেঙ্গে ছুটে আসছে। সাহেব দেখতে পেলেন ঝোপের আড়াল থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে আসছে। রাগে তার শরীরটা যেন ছিলে পরানো ধনুকের মত বেঁকে গেছে। শরীর দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে যাচ্ছে, কিছুতেই ফাঁকায় আসতে চাইছে না, তবু কে যেন তার গলায় অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে আনছে। আবার মধুর কণ্ঠে ডেকে উঠলো বাওয়ালী, আয় আয়। অদৃশ্য আকর্ষণ থেকে বাঘটার যেন মুক্তি নেই। তার সব শক্তিকে আর কেউ যেন নিয়ন্ত্রিত করছিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় রাগে-ঘৃণায় গজরাতে গজরাতে সে আসছিল।

সাহেবের তখন কোন হুঁশ ছিল না, হতভম্বের মত দেখতে লাগলেন বাঘটা গণ্ডির ধারে এসে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরছিল, প্রচণ্ড এক গর্জন করে এক লহমায় বনে লাফিয়ে পড়লো। আর তাকে দেখা গেল না। আর বাওয়ালী যেন দীর্ঘ রোগ-ভোগে সব শক্তি হারিয়ে ঝিমিয়ে পড়া নিস্তেজ গলায় হাসছে। বুড়ো বয়সে হঠাৎ কোন ছেলেমানুষি কাণ্ড করে ফেললে যেমন অসহায়, অপ্রস্তুতের ম্লান হাসি ফুটে ওঠে, ঠিক সেইরকম এক লাজুক হাসি ফুটে উঠলো বাওয়ালীর শুষ্ক ওষ্ঠে।

এ-হেন নোনা-বাদায় কোথাও পানীয় (মিষ্টি) জল নেই, সবখানেই

শুধু বিস্বাদ নোনা জল। পানীয় জল সহর বা গ্রাম থেকেই বড় বড় জালায় বয়ে আনতে হয় এবং সেই জল খরচ করা হয় কেবল পানীয় বা রান্নার কাজে এবং অত্যন্ত কার্পণ্যের সঙ্গেই তা ব্যবহার করতে হয়। কোন কারণে পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিলেই সর্বনাশ, কোথাও জল পাওয়া যাবে না। অনেক নদী-নালা পেরিয়ে আবাদ অঞ্চলে না পৌঁছনো পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানোর আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু এ পৃথিবীতে রহস্যের অভাব নেই, লোকচক্ষুর অন্তরালে খেয়ালী প্রকৃতি কখন যে কী খেলা খেলেন সাধারণ মানুষ তার কতটুকু খবর রাখে! সুন্দরবনের কয়েকটা দ্বীপে বনের গভীরে মিষ্টি জলের কূপ আছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রচণ্ড দাপাদাপি সত্ত্বেও কূপগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না। মাত্র তিন চার হাত গভীর গর্তের তলায় কেমন করে যে মিষ্টি জল জমে থাকে তার হদিশ কেউ জানে না। আমি সেই জল পান করেছি, জীবন ধারণের পক্ষে তা যথেষ্ট। যাই হোক—কূপগুলো কিন্তু মরণফাঁদ। আবাদ অঞ্চল থেকে বড় বড় জালায় সযত্নে বয়ে আনা অমূল্য মিষ্টি জলের সাশ্রয় করবার জন্য কাঠুরে ও জেলে-মাঝিরা সেই কূপের সন্ধানে আসে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, সুন্দরবনের বাঘও সে খবর রাখে। নৌকোর দেখা পেলেই সে কূপের কাছে লুকিয়ে ওৎ পেতে শুয়ে থাকে, কারণ সে জানে মানুষ এরপর মিষ্টি জলের সন্ধানে আসবে। আসেও তাই এবং দুর্ঘটনা যে ঘটে তার প্রমাণ পাবেন কূপের অদূরেই পড়ে থাকা বরাহের সাদা হাড়, হরিণের ভাঙ্গা শিং ও লোম আর মানুষের ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ও কাদা লেপ্টানো মাথার খুলি। দুর্ঘটনা ঘটলেই দলের লোকজন তৎক্ষণাৎ সেই দ্বীপ ত্যাগ করে। যাবার পূর্বে মৃতের পোষাকের একটুকরো কাপড় অথবা গামছা গাছের ডালে কিম্বা লাঠির মাথায় বেঁধে নদীর চরে পুঁতে দিয়ে যায়। উদ্দেশ্য পরবর্তী দল সেই দ্বীপ এড়িয়ে চলবে, বাঘ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হবে। তখন সেই নির্জন দ্বীপে সহসা কোন নৌকো ভেড়ে না, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, বাতাসের বেগে পত্‌পত্‌ করে ওড়ে

সেই মর্মান্তিক নিশানা। নরখাদকের এলাকায় আতঙ্ক শব্দটার এমন বেদনাময় নীরব ব্যাখ্যার নজীর পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এইভাবে বছরের মধ্যে পাঁচ-ছয় মাস জীবন ধারণের কঠিন তাগিদে ওরা আসে, ছোট ছোট দলে বনের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যায় কাঠ, মাছ, মধু ও মোম। কখনো বা অসমাপ্ত কাজ ফেলে চোখের জলে হায় হায় করতে করতে দাঁড় টানে।

সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার নেমে আসে, কিন্তু বাদার অন্ধকার আরও ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর মত। কেউ আর তখন তীরে নামবে না, নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে সে অন্ধকারকে ঠাওর করতে হবে। কেউ জানে না কোথায় কোন্ মামুলি আড়ালের পাশে ওৎ পেতে আছে বাঘ। নৌকোও নিরাপদ নয়, নাগালের মধ্যে পেলে লাফিয়ে পড়তে এতটুকুও ইতস্ততঃ করবে না। সেই কারণে নৌকোয় প্রহরীর ব্যবস্থা রাখতে হয়, গভীর জলে গিয়ে নৌকোর নোঙর ফেলাতে হয়। তবুও অঘটন ঘটে, ক্লান্ত চোখে নেমে আসে বাদার মরণ ঘুম। ধূর্ত বাঘ সেই চরম মুহূর্তটির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। কান পেতে শব্দ শোনে, শেষে নিশ্চিন্ত হয়, নিঃশব্দে জলে নেমে সাঁতার দেয়। শুধু চোখ দুটি ভেসে থাকে, কোন অনাবশ্যক ঢেউ ওঠে না। যখন জলে নামে ঠিক যেন জলচর। চার-পাচ মণ ওজনের বাঘ যখন চুপিসাড়ে নৌকোয় ওঠে তখন যে দোলা লাগে তা নদীর ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে বেশী নয়। ছলাৎ-ছলাৎ করে ঢেউয়ের শব্দ হয়, তির-তির করে বাতাস বয়। যখন ঘুমন্ত মানুষগুলো হাত পা গুটিয়ে নির্ভাবনায় আরামে পাশ ফিরে শোয়, সেই অবসরে বাঘ চকিতে তার শিকার বেছে নেয়। বাঘ কেন বেছে বেছে শিকার করে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও অজানা।

মার্জার জাতীয় প্রাণীরা জল বিশেষ পছন্দ করে না, কিন্তু সুন্দর-বনের বাঘ সে অস্বস্তির টুঁটি টিপে ধরে নির্মমভাবে। সর্বাঙ্গ বেয়ে তখন নদীর শীতল জল ঝরে পড়ছে টুপ টুপ করে অসহ্য, তবু একবারের

জন্যও সামান্যতম গা ঝাড়া দিয়ে জল ঝরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে তার দুর্বার পদক্ষেপ নির্বাচিত শিকারের দিকে এগিয়ে যায়। আশ-পাশের মানুষগুলোকে সোর্লার মত হাল্কা পায়ে ডিঙ্গিয়ে যায়, কেউ একটা নখের খোঁচাও খায় না। সম্পূর্ণ নিঃসাড়ে সে হত্যা করে, মৃতের শরীরে এতটুকু কুঞ্চন দেখা দেয় না। আর্তনাদ করা তো দূরের কথা, হাত পা পর্যন্ত ছুঁড়তে পারে না, এত নিপুণভাবে সে হত্যা করে। তারপর শরীরের মাঝখানটা কামড়ে শূন্যে তুলে ধরে আর ঠিক সেই একইভাবে একটার পর একটা মানুষ পেরিয়ে সন্তর্পণে ফিরে আসে। যখন জলে নামে তখনও বিশেষ শব্দ হয় না, মরাগাঙের ঢেউ অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ করে ওঠে। এত কাণ্ডের খবর পাশের মানুষটি পর্যন্ত টের পায় না, শুধু ফাঁকা জায়গাটা যা এতক্ষণ শরীরের উত্তাপে গরম হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সিঁধেল যখন সিঁধ কাটে তখন গৃহস্থ যেমন নিদালী মন্ত্রে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এই বাদার বাঘ। যখন নিশুতি রাতে নৌকোয় ওঠে, তখন নৌকোর আরোহীরাও গৃহস্থদের মত কি এক অজ্ঞাত কারণে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে, শরীরের কোথাও আর সাড়া থাকে না, ঘুমে বেহুঁশ—অচৈতন্য।

সুন্দরবনে জেলে-কাঠুরেদের তুলনায় মধুয়ালরাই বাঘের কবলে পড়ে বেশী সংখ্যায় মারা যায়। জেলে কাঠুরেরা সাধারণতঃ বনের গভীর অঞ্চলে যায় না, যেতে সাহসও করে না। কিন্তু মধুয়ালদের নির্ভর করতে হয় মৌমাছিদের তৈরী চাকের উপর। মৌমাছিরা কখন নদীর ধারে হেঁতালের বনে চাক বাঁধে, আবার গভীর বনে উড়ে যায়। সুতরাং মধুয়ালদেরই চরম ঝুঁকি নিতে হয় মধু সঞ্চয়ের জন্য। শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকেই মৌমাছিরা চাকে প্রথম মধু সঞ্চয় করে এবং এপ্রিলের শেষাশেষি প্রায় সব চাকই মধুতে ভরে যায়। সেই সময় নদীর উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা আনাগোনা করে। ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁক কিন্তু অত্যন্ত বিপদজনক। টলটলে মধুভরা ভারী

চাকগুলো যখন নুয়ে পড়ে, তখন বনে বসন্তের সমাগম হয়। মধুর বাতাস বয়, তরঙ্গে তরঙ্গে নদী আকুল হয়, সমস্ত বন মাতাল হয়ে ওঠে মধুমাসে। শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, মাংসাশী প্রাণী বাঘও এ প্রলোভন সামলাতে পারে না, মানুষকে অনুকরণ করবার এদের এক আশ্চর্য প্রবৃত্তি আছে। মানুষের মত বাঘও চাক ভাঙ্গতে যায়, দাঁতের এক কামড় বসিয়েই প্রাণপণে দৌড় শুরু করে বনের অলি-গলি দিয়ে ক্রুদ্ধ মৌমাছির হুল এড়াবার জন্য।

মধুয়ালরা কি ভাবে মধু সঞ্চয় করে সে কথা এবার বলি। দা, মশাল, টিন, ধামা ইত্যাদি নিয়ে হাঁটা আরম্ভ করে বনের সরু পথ ধরে। পথ কৈ? সুন্দরবনের জল-জঙ্গলে কোন পথ নেই, ওরা আকাশে মৌমাছিদের আনা-গোনা দেখে পথ নির্ণয় করে। কাদা, শুলো উপেক্ষা করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে উন্মাদের মত হাঁটে আকাশের দিকে চোখ তুলে। উর্ধ্ব মুখ হয়ে দল ছাড়া হয়ে পড়ে, তারপর পড়ি-কি-মরি করে পৌঁছয় চাকের কাছে। বনের দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে না, সেই সুযোগে বাঘ পেছু নেয়, কখনও সুবিধামত জায়গায় ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। মধুয়ালদের ধরবার জন্য বাঘকে বিশেষ কোন পরিশ্রম করতে হয় না, ওরাই অন্যমনস্ক হয়ে বাঘের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। মশালের ধোঁয়ায় প্রথমে মৌমাছি তাড়ায়, তারপর দা উঁচিয়ে যখন চাক কাটে তখন দৃষ্টি উপরে থাকায় বাঘের গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা আর চোখে পড়ে না। আবার কখন বাঘের সঙ্গে মধুয়ালদের লড়াইও হয়। দা, কুড়ুল ছাড়াও ওদের কাছে আর এক অস্ত্র থাকে, তার নাম 'সরকারি পটকা'। তখন দুর্ধর্ষ রয়েল বেঙ্গল টাইগার বনাম সরকারি পটকায় ক্ষণিকের এক হাস্যকর লড়াই শোচনীয়ভাবে শেষ হয়। এইভাবে গরীব নিরস্ত্র মধুয়ালরা অসহায়-ভাবে বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। সুন্দরবনের প্রায় বারো আনা মধু বনবিভাগ নির্দিষ্ট দামে কিনে নেন, তবু বনবিভাগের তরফ থেকে মধুয়ালদের জন্য সরকারি পটকা ছাড়া নিরাপত্তার আর কোন ব্যবস্থা নেই। এদের পাহারা দেওয়ার জন্য কোন পাকা শিকারীও

থাকে না, অথচ সুন্দরবনের মধু ও মোম প্রায় বিশ্ব-বিখ্যাত, বাজার দরও যথেষ্ট ভাল।

একবার নেতি-ধোপানীর জঙ্গলে একদল মৌলি নেমেছিল মধু সংগ্রহের জন্য। আমি সেই সময় দ্বীপের অপর প্রান্তে তল্লাসী চালাচ্ছিলাম। যাই হোক, মৌলীরা তো ওদের নিয়ম অনুযায়ী বনের পথ ধরে চলেছে। জল কাদা আর শুলোর হোঁচট খেতে খেতে চলেছে, দৃষ্টি ওদের ঊর্ধ্বদিকে। কারণ, মৌমাছির ওড়া লক্ষ্য করেই ওদের পথ নির্ণয় করতে হচ্ছিল। এমন সময় সামনে পড়লো মস্ত এক গোলপাতার বন। কি আর করা যাবে, নিঃশব্দে লম্বা লম্বা গোলপাতা সরিয়ে কখনো বা তার তলা দিয়ে গলে কোনরকমে এগুচ্ছিল। দলের লাইন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, যারা পিছিয়ে পড়েছিল তারা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ একজন মৌলী থেমে গেল, কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে তার। খুব সাবধানে ঝুঁকে গোলপাতার ভাঙ্গা অংশ সরাতেই একেবারে চক্ষুস্থির। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল লোকটা, মুখে 'রা' পর্যন্ত কাড়তে পারলো না। ভয়ে তার চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, হাঁ হয়ে দেখলো গোলপাতার নীচে একটা বাঘ অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বাঁ-হাতে পাতাটা তখনও ধরা ছিল, ভয়ে-উত্তেজনায় পাতাটা ছেড়ে দেওয়ার কথা মনে হয়নি।

পাতাটা ছেড়ে দিলেই সেটা যথাস্থানে আবার ফিরে যেত, ফলে বাঘটার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন বেলা দুটো থেকে আড়াইটে বেজেছে, বাঘটার দিবানিদ্রা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ঘুম-কাতর চোখে লোকটিকে দেখলো কয়েক সেকেণ্ড, এ-ভাবে কেউ কোনদিন তার ঘুম ভাঙ্গায়নি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। সেই অভাবনীয় কাণ্ডে মৌলীর ধড় থেকে তখন প্রাণ উড়ে গেছে, বেচারার আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না—গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। কোন হিতাহিত জ্ঞান আর ছিল না, বোধ-শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। এ-হেন অবস্থায় বাঘটা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো, দু'জনেই দু'জনকে দেখলো কয়েক পলক

ধরে। দু'জনেই হতভম্ব, হতবাক্। তবু এ-হেন অবস্থা তো আর অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না, তাই বাঘটাই সর্বপ্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠলো। তার লেজ শক্ত হয়ে গেল, লোম খাড়া হয়ে উঠলো, মাড়ি ফুলে পড়লো, তারপর বিড়াল ইঁদুরের সন্ধান পেলে যে-ভাবে ল্যাজ নেড়ে তাকায়—ঠিক সেইভাবে বাঘটা লোকটাকে দেখছিল আর ল্যাজ নাড়ছিল। এমন সময় দলের লোকেরা প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতেই বাঘটার লাফ থেমে গেল, চকিতে সেদিকে একবার তাকিয়েই বিদ্যুৎ-বেগে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর তাকে দেখা গেল না।

একজন মৌলী বাঘের মুখ থেকে ফিরে এল। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতেও ঘটলো না, এমন খবর কিন্তু বাদার হেড-লাইন নিউজ। দলের লোকেরা কৃতজ্ঞতায় মা মা বলে ডেকে উঠলো বনবিবিকে। এরপর আর অগ্রসর হওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না, সেদিনের মত অভিযান বন্ধ রইলো। ওরা যখন নদীর বাঁকের মুখে এসেছে সেই সময়ই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ঘটনাটি শুনে আমি তৎক্ষণাৎ গোলবনে প্রবেশ করি ও বাঘের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাই, কিন্তু বাঘটা যে-কর্দমাক্ত নালাটা লাফিয়ে পার হয়ে গেছে—সেই নালাটাই আমার অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিল। তার পরের দিন কুলতলীর পেট্রোল অফিসারের কাছে শুনলাম নেতি-ধোপানীর বনে বে-পাশীর দল থেকে বাঘে একজনকে তুলে নিয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম এই দলের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিল, কিন্তু কে গেল! যে বাঘ দেখেছিল—সে, না আর কেউ!

আর একটি ঘটনা। তখন চৈত্রের শেষ, নদীতে বাতাস উঠেছে। উত্তাল বিক্ষুব্ধ ঢেউ ফুঁসছে, বনের গাছপালা লুটোপুটি খাচ্ছে। শীতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে তখন জেগে উঠেছে বন্য-বাদা। রৌদ্রের প্রখর তেজে নোনা মাটিতে ফাট ধরেছে। ঈশাণ কোণে আসন্ন কালবৈশাখীর ভ্রূকুটি ভরা রুদ্র ইঙ্গিত। মৌলীরা শেষ অভিযানে বেরিয়েছে. বছরের শেষ মধু সঞ্চয়। বনবিবির মন্দিরে যথারীতি পূজো চড়ানো হয়েছে,

মা বনবিবিই এ সঙ্কটে একমাত্র পরিত্রাতা। মৌলীরা গুটি গুটি করে চলেছে, চলেছে প্রাণ হাতে নিয়ে কর্দমাক্ত খাল, নালা পার হয়ে শুলোর খোঁচা খেয়ে খেয়ে চলেছে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে। মৌমাছিরাই উড়ে উড়ে পথের নির্দেশ দিচ্ছিল, আর ওরা তাদের অনুসরণ করে চলেছে দুর্গম পথের আতঙ্ক মাড়িয়ে মাড়িয়ে আল্লা ও ভগবানকে সাক্ষী রেখে। সুন্দরবনের কাদার ফাঁক থেকে এক অদ্ভুত ভূতুড়ে শব্দ বের হয়, ওরা চমকে চমকে ওঠে সেই প্রাণান্তকর শব্দ শুনে। চমকে ওঠে ঝরা পাতা আর বুকের সেই আশ্চর্য অনিশ্চিত ঢিব্‌ঢিব্‌ শব্দে।

বাদার নোনা মাটি তখন তেতে উঠেছে, প্রচণ্ড গুমোটে গলা বুক শুকিয়ে কাঠ, জল কাদা থেকে কেমন একটা উষ্ণ ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উঠছে। তবু আসবার জো নেই, পিছিয়ে পড়লেই বিপদ। মোট আটজন লোকের এই দল। এবারের দলে আবার একজন নূতন লোক এসেছে, বাদায় কখন আসেনি, মধু ভাঙ্গাও দেখেনি। লোকটির নাম গোষ্ঠ পাঁড়ই। গোষ্ঠ বেশ বেঁটে আর সেই অনুপাতে মোটাও যথেষ্ট, বেচারা মধুর লোভে এসেছে। বাদার মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল কোন মুল্লুকে এসেছে। মস্ত একটা ধামা বগলে হেলে দুলে দলের পিছনে পিছনে আসছিল। সুন্দরবনে পথ চলার একটা কৌশল আছে, সবাই সে কৌশল জানে না, গোষ্ঠও জানতো না। বাদার ওপর ধপ্‌ ধপ্‌ শব্দ করে সে হাঁটছিল। একটা সঙ্কীর্ণ নালা সকলেই এক এক করে পেরিয়ে গেল, কিন্তু মোটা গোষ্ঠর পা কেবলই কাদায় পুঁতে যায়, মস্ত ধামাটা বগলে নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

চতুর্দিকেই বন ঝোপ ঝাড়। পাখীর ডাক নেই, এমন কি কীট-পতঙ্গদেরও কোন সাড়া শব্দ নেই। জল কাদা থেকে বাষ্প উঠছে। তাতে রোদ লেগে কেমন একটা কাঁপা কাঁপা তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছিল। যা দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করে, চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। গোষ্ঠর সঙ্গীরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ঝোপ সামান্য দুলে উঠতেই গোষ্ঠ দেখতে পেল কি একটা যেন সেখানে রয়েছে।

সুন্দরবনে প্রচুর হরিণ দেখা যায় সে শুনেছিল। ভাবলো নিশ্চয় হরিণ, কিন্তু হরিণটা যখন ঝোপের ওপর দিয়ে মুখ বাড়ালো তখন গোষ্ঠর চক্ষু কপালে উঠে গেছে। প্রকাণ্ড একখানা মুখ, চোখ ছুটো ধক্ ধক্ করছে। সে দৃষ্টিতে এমন এক সম্মোহিনী শক্তি ছিল যা গোষ্ঠকে আকর্ষণ করতে লাগলো। সমস্ত শরীর দেখতে না দেখতে অবশ হয়ে গেল, পা ছুটো পাথরের মত ভারী হয়ে যেন মাটিতে পুঁতে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে, তুনিয়ার সব বোল্‌তা সেই মুহূর্তে কানের মধ্যে বোঁ বোঁ করে উঠলো। গলা বুক শুকিয়ে গেছে, গোষ্ঠ মনে মনে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। বুক ঠেলে কান্নার মত কি একটা যখন উঠে আসছিল, ঠিক সেই সময় বাঘ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, ল্যাজটা শক্ত হয়ে তুলছে। মাত্র দশ বারো হাত দূর থেকে সে গোষ্ঠকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। কয়েকটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। বাঘটা দ্রুত এগিয়ে আসতেই যন্ত্রচালিতের মত গোষ্ঠ ধামা বাড়িয়ে ধরলো। প্রতিহত করা, আত্মরক্ষা করা! হয়তো না, কি কারণে ধামাটা বাড়িয়ে ধরলো হয়তো গোষ্ঠও তা জানে না। ধামাটা বাড়িয়ে ধরলো ওর ভিতর থেকে আর কেউ, হয়তো বাঘটাকে আড়াল করবার নয়তো জ্বলন্ত চোখ ছুটোকে ঢেকে দেবার ইচ্ছে তার হয়েছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, এরই মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেল। বাঘটা গর্জন করলো না, দাঁত খিঁচিয়ে ভয়ও দেখাল না, নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ধামার ওপর সামনের থাবা ছুটো তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর গোঁ-গোঁ শব্দ করে মুখ বাড়িয়ে গোষ্ঠর গলাটা কামড়ে ধরবার জন্য হাঁ করলো। অমনি তরোয়ালের মত বাঁকা ভয়ঙ্কর চারটে দাঁত বেরিয়ে পড়লো, ভক্ করে এক ঝলক তুর্গন্ধ ছুটে এল। গোষ্ঠ আবার একবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, কে কোথায় আছ—বাঁচাও! কিন্তু গলা দিয়ে টুঁ শব্দটিও বের হল না, গভীর আতঙ্কে ওর সর্ব শরীর কাঁপতে লাগলো।

এইভাবে গোষ্ঠ নিজের অজান্তে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে

লাগলো। ধামার ওপর উত্তেজিত বাঘের নখগুলোর খড়-খড় শব্দ হতে লাগলো, তবু বাঘ ধামা সরিয়ে ওর গলায় কামড় বসাতে পারছিল না। বাঘের থাবায় অসম্ভব শক্তি, তবু যখন সে পিছনের পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ায়, শরীরটা টান্ টান্ হয়ে ওঠে—তখন সামনের থাবায় আর বিশেষ জোর পায় না। বাঘের গোঁ গোঁ শব্দ শুনে নালার ওপারে সঙ্গীদের চলা হঠাৎ থেমে গেল, তারা মুখ ফিরিয়েই দেখতে গেল বাঘ গোষ্ঠর ধামায় থাবা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটা মুহূর্ত ওরা হতভম্ব হয়ে রইলো, তারপর প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো। দা উঁচিয়ে, টিন বাজিয়ে হৈ-হৈ করে ছুটে আসতে লাগলো। সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে একটা ধামা দিয়ে যতক্ষণ লড়াই করা যায় ঠিক ততক্ষণই গোষ্ঠ লড়েছে। এ লড়াই প্রকৃত বাঁচার লড়াই। বাঘটা একটা হাঁকোড় দিয়ে ধামা থেকে নেমে দাঁড়াল, তারপর এক লাফে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে গোষ্ঠর তখন মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছিল, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা ধামা দিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে ঠেকিয়ে রাখা কি মুখের কথা! দলের লোকের সেবা-যত্নে দুমড়ে যাওয়া গোষ্ঠর শরীরটার কাঁপুনি অতি কষ্টে থামলো, মুখে চোখে নোনা জলের ঝাপটা দেওয়া হল। তারপর ধরাধরি করে তাকে ফিরিয়ে আনা হল নৌকোয়। জল খেয়ে, তামাক খেয়ে দলের লোকেরা মধু কাটবার জন্য যখন আবার বেরিয়ে পড়লো, তখন গোষ্ঠ চিঁ চিঁ করে মিনতি করতে লাগলো—সেও যেন মধুর ভাগ পায়। যে মধুর লোভে প্রাণটা এইমাত্র যেতে বসেছিল, সেই মধুর জন্য ওর হাহাকার দেখে দলের সঙ্গীরা হেসে আশ্বাস দিয়েছিল, হ্যাঁ, ভাগের ভাগ সে ঠিক পাবে। গোষ্ঠ ক্লান্ত হয়ে নৌকোর গলুইতে শুয়ে পড়লো, ওর চোখের সামনে দিয়ে মৌলীদের লাইন তখন বনে মিলিয়ে যাচ্ছে। নদীর মিঠে হাওয়ায় ওর চোখে ঘুম নেমে এল, বাদার সেই ঘুম! সে ঘুমের কোন সাড় থাকে না।

সূর্য যখন গাছপালার ওপারে নেমে গেছে, নদীর জলে লম্বা

লম্বা কালো ছায়া পড়েছে তখনই মৌলীরা ফিরলো টিন ভরা মধু নিয়ে। নৌকোর অবস্থা দেখে ওরা অবাক হল, সেই সঙ্গে রাগ হল আনাড়ী লোককে বনে নিয়ে আসার বোকামী দেখে। দড়ি লম্বা করে নৌকোটাকে গভীর জলে রাখা হয়েছিল, আর সেই নৌকো এখন তীরে এসে ঠেকে রয়েছে! তাও আবার এই সন্ধেবেলা! লোকটার কি কোন কাণ্ড-জ্ঞান নেই। গজগজ করতে করতে ওরা নৌকোর কাছে এসে ডাকলো—গোষ্ঠ, গোষ্ঠ! কিন্তু কোন সাড়া নেই। তখন একজন নৌকোয় উঠে দেখে গলুইতে বাঘের কাদা মাখা পায়ের ছাপ। কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই, গোষ্ঠও নেই, শুধু কাঁথাখানা এলো মেলো হয়ে এক পাশে জড় হয়ে রয়েছে। সবাই হতভম্ব হয়ে রইলো।

এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছিল, তাড়াতাড়ি নোঙর তুলতে গিয়ে দেখে নোঙর নেই। নোঙরটাকে কে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। যেখানে নোঙর পড়েছিল সেখানেও বাঘের পায়ের ছাপ। চরের সর্বত্রই ছাপ পড়েছে। যেখানে নোঙর পড়েছিল, ছাপগুলো সেখান থেকে সোজা নৌকোয় এসে উঠেছে, আবার সেই পথেই ফিরে গেছে আর একটা নূতন টানা দাগ সঙ্গে নিয়ে।

সঙ্গীদের মুখে তখন কোন কথা নেই, চটপট নোঙর তুলে নৌকো ছেড়ে দিল, ঝপ্ ঝপ্ করে শুধু দাঁড় পড়ার শব্দ হতে লাগলো। খালের রাঙা জলের কোল ঘেঁষে একটা নিশানা উড়তে লাগলো। কেউ এক মুঠো ফুল ছুঁড়ে দিল না, একটা ধূপ কাঠি জ্বেলে দিল না। অস্ত রবির শেষ আলো একবার বুঝি থমকে দাঁড়ালো, তারপর গাছের মাথায় মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে এক ঝলক বাতাস এসে নিশানাটাকে দুলিয়ে দিল—গোষ্ঠ রে, মধুর ভাগ নিবি না! খালের চরে, বনের বাঁকে, নদীর টঁ্যাকে আর শিষের অভ্যন্তরে সে প্রতিধ্বনি করে উঠলো—নিবি না, নিবি না, নিবি না··· !

মধু কাটা সাঙ্গ হলেই সুন্দরবনের মরশুম শেষ হয়। তখন সেই নিরালার রাজ্যে শন্ শন্ করে বাতাস, আসন্ন কালবৈশাখীর ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপের পূর্বাভাস পেয়ে ঝঞ্ঝা ও প্রলয়ের গূঢ় ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে

থাকে বন। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় আর বর্ষার প্লাবনে প্লাবনে ছ'মাস রুদ্ধ থাকে তার দ্বার।

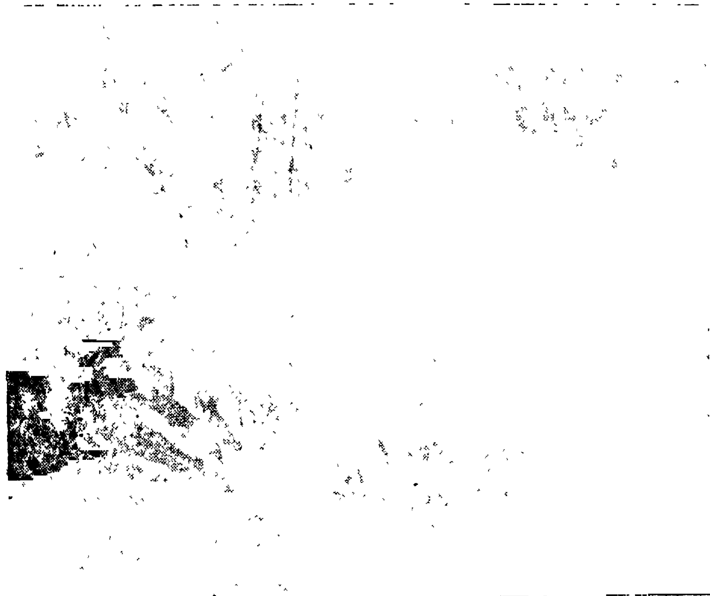
আবার যখন শীতের প্রথম শিরশিরে বাতাস বয়, নদীর ক্লান্ত ঢেউ শান্ত হয়, হাঁসেরা ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়, তখন সুন্দরবনের সবখানে আবার এক আশ্চর্য শিহরণ খেলে যায়। পাতায় পাতায় ইসারা হয়, সেই ইসারায় সলুই ডাকে, হরিণ মুখ তুলে আকাশ দেখে, বাঘের ডাকে এক আশ্চর্য কমনীয়তা ফুটে ওঠে। সে ডাক ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনে, বানরেরা খুসীতে দোল খায়। তখন আসে গৈরিক রঙের পাল তুলে মস্ত মস্ত কাঠের নৌকো, ছপ ছপ শব্দে দাঁড় ফেলে আসে জেলে-নৌকো। নদীতে নদীতে আবার টহল দিয়ে ফেরে বন-বিভাগের পেট্রোল বোট।

তখনও হয়তো গত বছরের পুঁতে রাখা নিশানার বিবর্ণ, ছেঁড়া এক ফালি ন্যাকড়া হাওয়ায় ওড়ে পত্‌পত্‌ করে, নয়তো বোবা কান্নায় মুখ নীচু করে খালের ঘোলা-জলে বিষণ্ণ ছায়া ফেলে…!

সুন্দরবনের নোনা বাদায় মানুষ-খেকো 'ব্যাঘ্র প্রকল্পকে' আপনি আমি যতই স্বাগত জানাই, কিন্তু যাদের কাজে কর্মে, পেটের ধান্দায় হামেশাই বনে-জঙ্গলে যেতে হয় তাদের মনে সুখ কৈ! 'আতঙ্ক' শব্দটা যে ছায়ার মত ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবু অতীতে এ বনে কি-ভাবে বাঘ শিকার হতো তার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষ-খেকো। কখনো কখনো বাঘের অত্যাচার এমন বেড়ে যায় যে, সেই সব দ্বীপে মানুষ-জন নামতে সাহস পায় না। কখনো কখনো আবার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে সেই বিশেষ দ্বীপের অত্যাচারী বাঘকে মারা উচিত হবে কিনা সেই ভাবনা ও দুর্ভাবনার জট এক অকল্পনীয় সমস্যার সৃষ্টি করে।

সেই সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রথমেই নিঃসন্দেহ হতে হবে যে প্রকৃতই বাঘের মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক কি না! সেই বহু কথিত উক্তি চিড়িয়াখানায় বা সার্কাসের খাঁচায় ওরা রুগ্ন, পঙ্গু, আফিম-খোর—

খেতে না পাওয়া আচ্ছন্ন বাঘ দেখা এক জিনিষ; আর স্বাধীন, মর্যাদা-পূর্ণ সাক্ষাৎ জঙ্গলের রাজা সুন্দরবনের বিখ্যাত মানুষ-খেকো 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' মুখোমুখি হওয়া আর এক জিনিষ। সমস্ত অঞ্চলটাই যার নখদর্পণে, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একচ্ছত্র যার সাম্রাজ্য—বনের আর সব বাসিন্দারা তাকে রীতিমত সমীহ করে। এ-হেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার যদি আবার পাকা মানুষ-খেকো হয়, তাহলে সেই মৃত্যুর



রাজ্যে পা বাড়াবার পূর্বে আর একবার ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত অযথা আত্মহত্যা করার বিশেষ কোন কারণ ঘটেছে কি না!

পূর্বেই বলেছি—সুন্দরবন দুর্ভেদ্য, হয়তো দুর্বোধ্যও। মনুষ্য-বসতিহীন, কর্দমাক্ত, শুলোয় কণ্টকিত এই বাদা-বনে কোন গ্রাম বা বস্তি নেই। এখানকার দুর্গম বনে কোন গৃহপালিত পশু চরে না, পাহাড় পর্বত নেই, সমস্ত গাছ-পালা ও খাল-বিল প্রায় একই রকম দেখতে। যতই দেখবেন ততই দিশেহারা হয়ে পড়বেন। এখানকার আকাশে আপনার চেনা জানা কোন পাখী ওড়ে না, নিরাপদ আশ্রয়ের

জন্য তেমন বড় গাছও পাবেন না, তাছাড়া বড় গাছেও বিষধর সর্পের আনাগোনা রয়েছে। এ হেন জল-জঙ্গলে যদি অকস্মাৎ সন্ধ্যা নেমে আসে, তাহলে আপনার অবস্থা একবার কল্পনা করে নিন। জন-মানবশূন্য সেই বিভীষিকার রাজ্যে যখন আপনি বাঘের খেই হারিয়ে দিশেহারা, খালের কোন মুখে নৌকো বাঁধা তারও কোন হদিস নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে যদি অন্ধকার গাঢ় হয়ে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, চতুর্দিকে ছড়ান শুলো ও কাদার মধ্যে আপনাকে একটা কঠিন শপথ নিতেই হবে—যদি প্রাণে বাঁচেন তো এ-বনে আর নয়, কখনই নয়। যতই অন্ধকার বাড়বে ততই দিগন্ত বিস্তৃত রাক্ষসী নদীর অতল তল থেকে লক্ষ নাগের ফণা মেলে কালো কালো ঢেউ তীব্র বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে বনের কিনারায়। তখন হু হু করে কেঁদে উঠবে বাতাস, বনের পাতায় পাতায় মাথা কুটবে। ঝুপ্ ঝুপ্ করে যখন নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়বে, তখন বনের কীট-পতঙ্গেরাও ভয়ে সাড়া দেবে না। এ হেন সুন্দরবনে কোন নির্দিষ্ট পথ নেই, মাটি কোথাও শক্ত নয়। অসম্ভব কাদার মধ্যে সুচলো শুলো ভীষ্মের শর-শয্যার মত পাতা রয়েছে। স্বচ্ছন্দে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও নেই, অথচ আপনি জানেন না নৌকো ভেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ মাটিতে পেট ঘষড়ে-ঘষড়ে আপনাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। এ বনে বাঘ খুঁজতে হয় না, বাঘই মানুষ খুঁজে বেড়ায়। তাছাড়া সুন্দরবনে বিষধর সর্পেরও যথেষ্ট উপদ্রব রয়েছে। আপনি যখন ঝোপ-ঝাড় ঠেলে বা:গাছের তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে বাঘের চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছেন, তখন ক্ষণিকের জন্যও আপনার নজরকে সরিয়ে আনতে হবে আপনার আশ-পাশের ঝোপঝাড়ের গোড়ায় অথবা নীচু হওয়া কোন ডালের দোলার ওপর। কে জানে কোন্ ঝোপের গোড়ায় অথবা কোন্ ডাল জড়িয়ে বিষধর ফণা তুলে রয়েছে।

আমি একদিন ভোরবেলা মায়া-দ্বীপের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। পথের ওপর জোয়ারের জলে ভেসে আসা কতকগুলো

কালো কালো পচা কাঠ জড় হয়েছিল। সেগুলোকে ডিঙ্গিয়ে যাবো বলে যেই লম্বা পা বাড়িয়েছি, অমনি পিছন থেকে আমার সঙ্গী রস্থল মিঞা খুব আস্তে বললো, সাপ। কথাটা কানে আসা মাত্র আমি যেভাবে পা রেখেছিলাম সেই ভাবেই স্থির হয়ে গেলাম। এতটুকু নড়াচড়া না করে শুধু চোখ দুটোকে নীচে নামিয়ে আনলাম। সেই কাঠের স্তূপের মধ্যে থেকে একটা সাপ মুখ বার করছে। সাপটা প্রায় আমার হাতের কজির মত মোটা, চার পাঁচ হাত লম্বা। রং ঘোর কালো। কাঠের স্তূপ থেকে সে ধীরে ধীরে মাথা বার করলো, লম্বা চেরা জিভ কয়েকবার বার করে আবার মুখের মধ্যে টেনে নিল। রস্থল মিঞা ততক্ষণে দুটো শুকনো ডাল যোগাড় করে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি ডালটা শক্ত করে ধরে সাপের মাথা লক্ষ্য করে সজোরে আঘাত করলাম। ডালটা ছিল পোকা ধরা, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। আমার হাত তখন খালি, সাপটা ফোঁস্ করে ফণা তোলার আগেই এক লাফে ছিট্‌কে সরে এসেছিলাম, তারপর রস্থলের হাত থেকে অপর ডালটা নিয়ে সাপটাকে পেটাতে আরম্ভ করলুম। ডালটা মজবুত ছিল, আঘাতের চোটে সাপটা মরে গেল। তখন তাকে টেনে বার করে মেপে দেখলুম প্রায় পাঁচ হাতের মত লম্বা। রস্থল বললো, আঁধারে কেউটে।

সুন্দরবনের ডাঙ্গায় বাঘ, গাছে সাপ আর জলে কুমীর ও কামট সদা-সতর্ক হয়ে বেড়ায়। সরু খালে কুমীর আসতে না পারলেও ক্ষুধার্ত কামটে ভর্তি। সুতরাং জলে হাত বা পা ডুবিয়ে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কামট ছোট-জাতের হাঙ্গর, কিন্তু এদের দাঁত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। একদিন সারা সকাল জাল ফেলেও খাওয়ার মত কিছু মাছ জুটলো না, তখন সাত আট দিন জলের ওপর আছি—রসদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এমন সময় সর্দার মাঝি তোবারকের জালে ভারী মতন কি একটা আটকে গেল। অনেক কষ্টে চার পাঁচজনে মিলে জাল তুলে দেখি এক বাচ্চা কামট। প্রায় ছ' সাত সের ওজন হবে। তার বিক্রম কি! লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকো দুলিয়ে দেওয়ার পর

শেষে কুড়ুল দিয়ে তাকে বধ করা হল। ঈশ্বর সেদিন জালে কামট পাঠিয়েছেন, অতএব ধ্বনি ভোটে স্থির হল কামটের মাংস রান্না হবে। কামট তো কামটই সই! কামটের ঝোল, কামটের ঝাল, কামটের চপ্ সে এক এলাহী ব্যাপার, যা কিছু দেখি সবই কামট। খেতে কিন্তু মন্দ নয়, অনেকটা পাকা সোল মাছের মত।

সুন্দরবনের রাত যেমন মোহময়, তেমনি কুটীল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলেছে ষড়যন্ত্র। যখন রাত গভীর হবে, পৃথিবীর কোথাও কোন সাড়া শব্দ থাকবে না, ঠিক তখনই জেগে ওঠে সুন্দরবনের অতৃপ্ত আত্মা। নৈশ স্তব্ধতা খান্ খান্ করে ভেসে আসবে এক অশরীরী আর্তনাদ, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও! সেই আর্ত হাহাকার তীরের মত এসে কানে ঝাপটা মারবে। শিরায়-শিরায় কি উন্মাদনা নেচে বেড়াবে তখন, এমন অভিজ্ঞতা বুঝি আর কখনো হয়নি। স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে পড়বেন, অজানা আতঙ্কে লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠবে। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠা-নামা শুনতে শুনতে হিম হয়ে যাবে সর্বাঙ্গ, মনে পড়বে দশ পনেরো মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। যে দ্বীপে আপনার নৌকো ভেড়ানো রয়েছে, সেই দ্বীপে আর কোন নৌকো আসেনি। জনমানবশূন্য সেই দ্বীপের গভীর বন থেকে কে অমন করে হাহাকার করে উঠলো! কোন বুদ্ধি দিয়েই এর জবাব পাবেন না।

আপনার নৌকোর সর্দার মাঝি যে এতক্ষণ মাথা হেঁট করে বসেছিল, আপনার অসহায় ভাব দেখে সামান্য একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেবে। তারপর একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বার করতে করতে আড়চোখে আপনাকে একবার দেখে নেবে। চোখের ঝুলে-পড়া চামড়ার ফাঁক দিয়ে মিট্ মিট্ করে চেয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সিগারেটের অর্ধেকের ওপর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তারপর শুরু করবে, এ নোনা বাদার দেশ—এখানে কত খুন-খারাপি হয়, কত অপঘাতে মৃত্যু হয়। তারা সব যাবে কোথা বাবু! চোদ্দ বছর বয়সে বাপের হাত ধরে বাদা বনে এসেছিলুম। কত কি যে

দেখলুম তার কোন লেখা-জোখা নেই। তা দু-কুড়ি বছর হল বাদা বনে যাতায়াত করছি। এ বন বড় সর্বনেশে বন বাবু, যে একবার এসেছে সেই মরেছে। আগে বিশ্বাস করতুম না, বন এমন করে টানে। ছেলে-ছোকরাদের বলি যাসনে, কিন্তু নিজে না এসে থাকতে পারি না। সারাদিন হাল ধরে নদী পাড়ি দিই, গল্প গুজব করি, হাসি মস্করাও হয়, কিন্তু রাত্রিতে আমি অন্য মানুষ। সবাই যখন ঘুমোয়, আমি ঘুমুতে পারি না। ওদের কথা ভাবি, যাদের এ বনে রেখে গেছি। যারা কাঠ কাটতে এসে আর ফেরেনি, যারা মাছ ধরতে এসে আর ঘরমুখো হয়নি, আর যারা মধু কাটতে, গিয়ে হারিয়ে গেছে, সেইসব পুরোনো সঙ্গীরা অন্ধকারে আমার মনের মধ্যে এসে ভীড় করে। যে সব হিন্দুর ছেলের সৎকার হয়নি, মুসলমানের ছেলের কবরে মাটি পড়েনি তারাই আসে। গাঁয়ের নৌকো দেখলে, গাঁয়ের মানুষের সাড়া পেলে নিশুতি রাতে এমন করে কেঁদে কেঁদে ডাকে।

তাই তো নূতন বাবুদের বলি—ও কিছু নয়, হাওয়ার কান্না, নিঃসঙ্গ বাদার কান্না। কিন্তু মনে মনে জানি—কাঁদছে আমার গাঁয়ের মানুষ, কাঁদছে আমার কত আপনজন। এ কান্না কি সবাই শুনতে পায়! এ কান্নায় সাড়া দিতে নেই, যে দেয় তার সর্বনাশ হয়। বাসন্তীর অশ্বিনী মণ্ডলদের চেনেন বাবু? সেই অশ্বিনী মণ্ডলের ভাই-পো সাড়া দিয়েছিল। আমি পই পই করে বলেছিলুম, তা আমার কথা কেউ শুনলো না। আমার নৌকোয় চেপেই অশ্বিনী মণ্ডল ভাইপোর দল বল নিয়ে সেবার হরিণ মারতে এসেছিল। বনের সর্বত্রই তো হরিণ আছে, কিন্তু বন্দুক নিয়ে এলে আর দেখা যায় না। তাই হরিণের ঝাঁক দেখলে সিঁড়ি দিয়ে গাছের ওপর উঠে বসতে হয়। অশ্বিনী মণ্ডল তার ভাইপো ও আমি এক গাছে বসেছিলাম, আর অপর শিকারীরা কোণের মুখে সেই বড় বাইন গাছে। সন্ধ্যের মুখে হরিণ ডাকলো, বনের মধ্যে শব্দও হল, কিন্তু বন্দুকের পাল্লার মধ্যে কোন হরিণ এল না। আশায় আশায় বসে আছি, এদিকে সাঁ সাঁ করে রাত বাড়তে লাগলো। ক্রমে বন নিঝুম হয়ে এল, কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ রইলো না।

এখন শেষ আশা সেই ভোরবেলা কখন হরিণরা ফিরবে। এখন কত রাত জানি না, হয়তো আড়াইটে-তিনটে হবে। বাতাস একদম পড়ে গেছে, আকাশে আধখানা চাঁদ—তেমন আলোও নেই, নজর চলে না এমনি ধোঁয়া ধোঁয়া মত।

এমন সময় মোড়লের ভাই-পো বলা নেই, কওয়া নেই বন্দুক নিয়ে হঠাৎ গাছ থেকে নামতে আরম্ভ করলো। হাঁ-হাঁ করে উঠলুম, করছো কি! মোড়ল ভাই-পোর হাত চেপে জিজ্ঞাসা করলো, কোথা যাস্? শিকারে বসে কথা বলতে নেই, কিন্তু ছেলেটার ব্যাপার দেখে কথা বলতেই হল, কোথা যাস্? ভাই-পোর চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো, উত্তেজনায় যেন হাঁফাচ্ছিল। চাপা স্বরে উত্তর দিল— কেন, তুমি শুনতে পাওনি গুপী-দা ডাকছে! কোণের মুখে হরিণের ঝাঁক আসছে। মোড়ল অস্বীকার করলো—না, না সে কিছু শুনতে পায়নি। আমি বললুম—স্থির হয়ে বস, রাত্রে গাছ থেকে নামতে নেই। কিন্তু ভাই-পো কিছুই গ্রাহ্য করলো না, গুম্ হয়ে বসে কি যেন শুনতে লাগলো। আমি মোড়লকে ইশারা করলুম, মোড়ল ঘাড় নেড়ে সায় দিল—আমার কথা সে বুঝতে পেরেছে।

আবার ভাই-পো ছটফট করে উঠলো, বললো—কাকা তুমি শুনতে পাচ্ছো না, ওরা ডাকছে! বনের নিয়ম ভঙ্গ করে মোড়ল ধমক দিয়ে উঠলো, খবরদার—নামবি না। কিন্তু বাবু, সেই যে বলেছিলুম—এ ডাকে সাড়া দিতে নেই, যে দেয় তার সর্বনাশ হয়।

মোড়লের ভাই-পো সেই ডাক আবার শুনলো, বার-বার তিনবার। এবার আর সে কাকার অনুমতি চাইলো না, বন্দুক নিয়ে গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়লো। তারপর অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে মিলিয়ে গেল। আমাদের মুখে আর কথা ফুটলো না। অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। মোড়ল বুকের ওপর জামাটা খাম্‌চে ধরে সেই যে কাঠ হয়ে বসে রইলো, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আর নড়লো না। ভাই-পোর দেখা নেই, বন্দুকেরও শব্দ নেই, এদিকে সাঁ-সাঁ করে রাত কেটে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠলো,

তবু ভাই-পো ফিরে এল না। মোড়ল তখন বসে বসেই হাঁফাচ্ছে, বুকের মধ্যে যেন 'হাপর' চলেছে। রোদ উঠতেই দু'জনে নেমে পড়লুম, তারপর গুপীদের গাছ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলুম। মোড়ল ভাই-পোর নাম ধরে ডাকতে লাগলো, আমি জানতুম সাড়া মিলবে না, কেমন করে মিলবে!

মাঝ পথে এসেই পা দুটো যেন কাদায় পুঁতে গেল, তবু গুটি গুটি করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বন্দুকটা পড়ে আছে কাদায়, আর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে ভাই-পোর আধ খাওয়া দেহ। দুটো হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে শক্ত করে চেপে ধরেছিল বাদার দলদলে নরম পলিমাটি। হাতের আঙ্গুলগুলো গভীরভাবে পুঁতে গিয়েছিল সেই কাদায়। নখ দিয়ে ফালা ফালা করেছে, কাদায় হিজি-বিজি কেটেছে —নখের পরতে পরতে তার চিহ্ন। সকাল বেলায় যখন আমরা এসে পৌঁছলুম, তখন সেই কর্দমাক্ত মুঠি শিথিল হয়ে মেলে ছিল আকাশের দিকে। প্রবল জ্বরের তোড়ে মানুষ যেমন কাঁপে, ঠিক তেমনি কাঁপাছিল মোড়ল। শোকে, আতঙ্কে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত তখন, তবু প্রাণপণে একবার চিৎকার করে উঠলো, "গুপীরে—এ-কি করলি!"

এইভাবে সর্দার-মাঝি তার কাহিনী শেষ করবে। দু' কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করবে।—বাবু এ হচ্ছে বাদা অঞ্চলের 'বেগো-ভূত'! যারা বাঘের কবলে পড়ে অকালে প্রাণ হারায়, যাদের অতৃপ্ত আত্মা কামনা-বাসনার জ্বালায় নির্জন নোনা-বাদায় হাহাকার করে বেড়ায়, যাদের মৃতদেহের সৎকার হয় না—পারলৌকিক কোন ক্রিয়া হয় না, যাদের কবরে এক-মুঠো মাটি চাপা দেওয়ার সুযোগ মেলে না, তারাই নিশুতি রাতে গাঁয়ের মানুষ দেখলে —গাঁয়ের নৌকো দেখলে নোনা-বাদার শূন্য বনে হাহাকারে কেঁদে ওঠে, 'বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও'...!

এই রকম অসংখ্য আশ্চর্য ঘটনা বন্য-বাদায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে থাকে। একবার শিকারে এসে নারায়ণতলীর খালে নৌকো বেঁধে বাঘের সন্ধানে বনে নামলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একটা

জায়গা পছন্দ হল। বাঘের চলাচলের পথ, পায়ের ছাপে জায়গাটা প্রায় ক্ষত-বিক্ষত। যে গাছটা পছন্দ করলাম তার সামনেই নদী, পিছনে কোমর সমান উঁচু নল-খাগড়ার বন। গাছটা বিশেষ বড় নয়, কিন্তু গুলি করবার পক্ষে গাছটার পজিশন এত ভালো যে, বাঘ আট-দশ হাত সোজা লাফাতে পারে জেনেও বসবার জায়গা করে ফেললাম। নদীর নির্জন চরে বাঘ রাত-দুপুরে হাঁটে, ঘাসের বনে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয় এবং সেখানে বসেই যে শিকারের ওপর নজর রাখে, দুমড়ে পড়া ঘাসের চেহারা দেখেই তা অনুমান করতে কষ্ট হল না। সুতরাং সামনের নদীর চড়া আর পিছনের ঘাসবন দুটোরই সমান গুরুত্ব।

নৌকো বাঁধা রইলো সেই খালের মুখে, আমি দু' মাইল হেঁটে এসে মাচায় উঠলাম। দিনের আলো থাকতে থাকতেই চারদিক বেশ ভাল-ভাবে বার বার দেখে নিলাম; কারণ, দিনের দেখা আর রাতের দেখার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমি মাচায় সাধারণত কোন সঙ্গী নিই না, সুতরাং দিন থাকতেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল এবং সেই সন্ধ্যা রাত্রির ঘন অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। তখনও চাঁদ ওঠেনি, খুব ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। নদীর ঢেউ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনিনি, হঠাৎ ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা ডাকতে শুরু করলো। তখন অনেক রাত, চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় নদীর জল চক্‌চক্ করে উঠলো। অনেক দূর থেকে হরিণের 'টাউ-টাউ' ডাক ভেসে এল, উত্তেজনা-হীন সুরেলা সেই ডাক। বাঘ দেখলে যে ভয়ার্ত ডাক ডাকে, এ ডাকে আতঙ্কের সে ইঙ্গিত নেই।

এমন সময় এক বিপদ দেখা দিল। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর, চাঁদ গাছের আড়ালে চলে গেছে; ফলে, গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো এসে নদীর চড়ায় দুলতে লাগলো। তাতে এমন এক বিশ্রী আলো-আঁধারীর সৃষ্টি হল যে, আমার ভয় হল বাঘের নিঃশব্দে চলা-ফেরা হয়তো বুঝতে পারবো না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

চোখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু বাঘ দেখতে পেলুম না। ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম, থাবার এত টাটকা দাগ দেখেছি তবু কেন বাঘ এল না— তবে কি খাল পেরিয়ে অন্য পারে গেছে!

এমন সময় অবাক হয়ে দেখলুম নদীর চরে কে একজন হেঁটে চলেছে। এ হেন ভয়ঙ্কর স্থানে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ রাত্রে একা হাঁটতে পারে না। সুতরাং রাইফেল কোলের ওপর রেখে দু'হাতে ভাল করে চোখ রগ্ড়ে নিলুম। নিশ্চয় ভুল দেখছি—এ হতেই পারে না। কিন্তু চোখ পরিষ্কার করার পরও দেখলাম ছায়া মূর্তিটা জলের ধার ঘেঁষে হেঁটে চলেছে। ঠিক জেলেদের মত আঁটো-সাঁটো গামছা পরা। আমার কাছে একটা বাড়তি পাঁচ-সেলের টর্চ ছিল, ভাবলুম আলো ফেলে লোকটাকে ডাকি। টর্চটা তুলে নিয়ে একটু উঁচু হয়ে আলো ফেলতে গিয়ে দেখি মূর্তিটা নেই। অথচ নদীর চড়ায় কোন গাছপালা নেই যে মূর্তিটা আড়াল পড়বে। তাহলে সে গেল কোথায়, ভেবে সমস্ত চড়াটায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম। কোথাও কিছু নেই, লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। টর্চটা যথাস্থানে রেখে অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময় পিছন থেকে আমার কানে কে যেন ফুঁ দিল—বরফের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

অনেকে ভাববেন আমি ভৌতিক গল্প আমদানি করছি। ঠাণ্ডা হাওয়াটা কানে লাগতেই বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরে তাকালাম, কিচ্ছু নেই। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। হঠাৎ নীচে নজর পড়লো, দেখি ঘাস-বনটা দুলছে, কি যেন একটা সট্ করে সরে গেল এবং ঘাস-বনের দোলা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল কেউ ওর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাইফেলটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম, কিন্তু কিছুই আর নজরে এল না। কি জন্তু মোটেই বুঝতে পারলাম না—হরিণ, শুয়োর, না—বাঘ! যদি বাঘ হয়, তাহলে কি সে ঘাস-বনে লুকিয়ে আমায় দেখছিল! আমার নড়াচড়া, টর্চ নিয়ে উঁচু হয়ে বসা দেখে কি তার সন্দেহ হয়েছিল যে আমি তাকে দেখে ফেলেছি! তাই কি সে অমন চোরের মত পালিয়ে গেল! না, আর কিছু! ঠিক সেই সময়ই কানে অমন ঠাণ্ডা

হাওয়াটাই বা কোথা থেকে এসে লাগলো! এর ব্যাখ্যা আজও জানি না।

পরদিন সকাল-বেলায় নৌকোয় ফিরে এসে বুড়ো করিম আলীকে সব বললাম। করিম আলী চোখ বড় বড় করে আমার কথা শুনলো, তারপর নদী থেকে এক বৎনা জল তুলে কি মন্ত্র পড়ে সেই জল আমার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললো, রাত্রিতে একা আর যাবেন না। জানি, আপনার ছুটো ক'লজে—তবু এত সাহস ভাল নয়। যদিও করিম আলীর কথা আমি রাখতে পারিনি, তবুও এ ঘটনার উল্লেখ করলাম অভিজ্ঞতার খাতিরে। করিম আলী একদিন দুঃখ করে বলেছিল, বাদার কথা ক'টা লোকই বা জানে···!

সুন্দরবনের সঙ্গে যাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে তাঁরা প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, এ অঞ্চলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেবার মানুষেরও অভাব নেই। আমার এক শিকারী বন্ধু সুন্দরবনে ঘুরতে ঘুরতে ন-বেঁকীর খালে এসে নৌকো ভেড়ালেন। মাঝিরা বললো, বাবু জায়গাটা খারাপ। আমার বন্ধু ও অন্যান্য বাবুরা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, যে যুগে চাঁদে রকেট যায় সে যুগের মানুষের মুখে ভূতপ্রেতের গল্প মানায় না। সারাদিন খাওয়া ও মাছ ধরতে কেটে গেল, তারপর এল রাত। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর, সকলেই শুয়ে পড়েছেন, কেবল একজন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছেন। নৌকোয় এ পাহারা অত্যন্ত জরুরী। প্রথমতঃ বাঘের ভয়, দ্বিতীয়তঃ ডাকাতের ভয়।

যাই হোক, নিঝুম নিস্তব্ধ রাত সাঁ-সাঁ করে কেটে যাচ্ছে, দু' পাশের লম্বা লম্বা গাছগুলো ভূতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর ভাঙ্গা ঢেউ নৌকোর গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ করে।

এমন সময় নৌকোর ওপর শব্দ হতেই প্রহরী চমকে উঠলো, কিসের শব্দ দেখবার জন্য উঠে গিয়ে দেখে এক তাল কাদা। পর মুহূর্তেই আর এক-তাল কাদা এসে পড়লো ঠিক তার পাশে। প্রহরী

ভেবে পেল না এত রাত্তিরে কাদার তাল কে ছুঁড়ছে। গুলি-ভর রাইফেল বাগিয়ে ধরে চতুর্দিকে তাকাতে লাগলো, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ আবার এক তাল কাদা এসে পড়লো, তখন প্রহরী ভয়ে ভয়ে সঙ্গীদের ডাকলো। ক্রমে নৌকোয় মাঝি-মাল্লারাও জেগে উঠলো কাদার তাল কিন্তু সমানে পড়তে লাগলো। বাবুরা এর কোন কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না, মাঝিরা বললো, অপদেবতা। রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই গোটা বনটা গমগম করে উঠলো, হরিণ ডেকে উঠলো, বনের মধ্যে কোথায় যেন ডাল ভাঙ্গার শব্দ হল। তারপর আবার কাদার তাল পড়তে লাগলো। এরপর এমন বুকের পাটা কার আছে যে বাদায় দাঁড়িয়ে বলবে গাঁজা-খুরী! সেই রাত্তিরেই নোঙ্গর তোলা হল, তারপর মাঝিরা যে যার জায়গায় বসে ছপ্‌ছপ্‌ করে দাঁড় বাইতে লাগলো। হয়তো তখনকার মত অবিশ্বাসের ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেছে।

শিয়ালফেলির বনে সেদিন সন্ধ্যা নেমে এল, অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা। তখন সুন্দরীগাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে, ওর পাশে বাইন্‌ ডালে এক জোড়া বানর ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে চাঁদের দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে। নিঝুম নিস্তব্ধ ভিজে বন থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। এ হেন মনোরম পরিবেশে খালের জল তোলপাড় করে, নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করে, দাঁড়ের শব্দ করে, জল ছিটিয়ে আমাদের নৌকো এসে নোঙ্গর ফেললো মাঝ-খালে! এ অভিযানে আমার সঙ্গী ছিলেন—অনিল দাস, মাধব মুখার্জী, শচীনন্দন মিত্র, দ্বিজেন রায়চৌধুরী, হীরক নন্দী।

গোবেদের খাল থেকে আমরা ফিরেছি। চায়ের মগ নিয়ে সকলেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেলুম। প্রকৃতি তখন রমণীয় সাজে সেজেছে, ভরা জোয়ারে চাঁদের আলো ঠিক্‌রে পড়ছিল। জোয়ারের জলে ভেসে আসে মাছ ধরবার জন্য মাছ-ধরা পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে কিচ্‌ কিচ্‌ করে ডেকে যাচ্ছে। জোয়ারের হাওয়া লেগে গাছের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ ছুটে আসা বাতাস খালের চরে কি কানাকানি করে শব্দ করে উঠলো 'ছল্‌ ছল্‌ ছলাৎ!'

ক্রমে সেই রাত গভীর হল, গাঢ় হল। সকলেই তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন, সে রাতে আমাদের মধ্যে কে প্রহরী ছিল আজ আর মনে নেই, তবে কেউ একজন ছিল। ভাঁটার টানে তখন হু-হু করে জল নেমে যাচ্ছিল। দু-পাশের বিস্তৃত উঁচু চরের গভীর কাদার স্তর ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল। দেখতে দেখতে খাল শূন্য হয়ে গেল, কোথাও আর ততটুকু জল স্থিতি হতে পারলো না। প্রহরী অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল, হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে গেল—দেখলো নৌকো একেবারে খালের গর্ভে কাদার ওপর কাৎ হয়ে পড়েছে, আর দু'পাশে প্রাচীরের মত খাড়াই কাদার দেয়াল চাঁদের আলোয় রূপোর পাতের মত ঝল্‌মল্‌ করছে। চতুর্দিকে শুধু কাদা, সেই কাদার সমুদ্রে চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছিল। তার দু'পাশে সারিবদ্ধ বন। শেয়ালফেলির বনে বাঘ, হরিণ, শুয়োর, সাপ সবই আছে, কিন্তু কাদার সমুদ্র পেরিয়ে কেউই আসতে পারবে না। শিয়ালফেলির বন উঁচু ডাঙ্গায় অবস্থিত। যে খালে আমাদের নৌকো নোঙ্গর করা ছিল, সে খাল ক্রমশই ঢালু হতে হতে সপ্তমুখীতে গিয়ে মিশেছে।

প্রহরী ভয় পেয়ে সকলকে ডেকে ঘুম থেকে তুললো। আমরা ঘুম থেকে উঠে কোথায় আছি বিশ্বাস করতে পারলাম না। যেদিকেই তাকাই শুধু কাদা আর কাদা। আমাদের অভিজ্ঞতার তখনও বাকী ছিল, সেই কাদার স্রোতে আমাদের নৌকো সহসা চলতে আরম্ভ করলো। জল নেই, স্রোত নেই, স্রেফ কাদার ওপরে পিছলে-পিছলে নৌকো তরতর করে নেমে যাচ্ছে। সেই প্রচণ্ড টানে নোঙ্গরের দড়ি পটাং করে ছিঁড়ে গেল। কাদায় বাঁশ পুঁতে নৌকো থামাবার চেষ্টা হল, কিন্তু দুরন্ত বেগকে থামানো সম্ভব হল না, কয়েকখানা বাঁশ হাত ছাড়া হয়ে গেল। কাদার মধ্যে প্রাণপণে দাঁড় চেপে ধরা হল। দাঁড় ভেঙে গেল তবু নৌকো থামলো না। পিছনটা মাস্তুলের মত উঁচু হয়ে রয়েছে, আর সামনের সরু মুখ কাদা কেটে কেটে হু-হু করে নেমে চলেছে। কোথায় চলেছি জানি না, যে-কোন মুহূর্তে আবার নৌকো উল্টে যেতেও পারে।

সামনেই একটা বাঁক দেখতে পেয়ে চোখ বুজলুম, জানি আর কয়েক মিনিট পরেই ওই বাঁকে আছড়ে পড়বো। চোখ বোজা অবস্থাতেই বাঁকটা পেরিয়ে গেলুম, কোন অঘটন ঘটলো না। যে মুহূর্তে আছড়ে পড়বো বলে ভেবেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে কখন চোখ খুলে দেখে নিয়েছি নৌকোটা পিছলে আর এক ধার দিয়ে নেমে যাচ্ছে। যেমন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ-ই আবার যাত্রা থেমে গেল। তারপর জোয়ার এল, জলের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোও আবার ভেসে উঠলো। এমন বিপদে আর কখনও পড়িনি, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সুন্দরবন এক চলমান অরণ্য, এর কোনটা অলৌকিক আর কোনটা নয়, বুদ্ধি দিয়ে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর একবার নারায়ণতলীর খালে প্রবেশ করতেই সৌকত আলী দেখিয়ে দিল সেই মন্দিরটা। এই মন্দিরের কথা আমিও শুনেছিলুম। দেখলুম খালের উঁচু পাড়ে গোলাপী রঙের পাকা মন্দির তখনও প্রায় নূতনের মত দেখাচ্ছিল। একজন সেবায়েত-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে আর কোথাও এমন মন্দির নেই।

এক জেলে তার যথাসর্বস্ব পণ করে নারায়ণতলীর খালে মাছ ধরতে এসেছিল। অনেকেই বারণ করেছিল, কিন্তু সে কারুর কথাই গ্রাহ্য করেনি। বনবিবির ওপর ভরসা রেখে সেই খালের ধারে পড়ে রইলো। লোকে বলে, বনবিবির কৃপায় সে এত মাছ পেয়েছিল যে, রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়। আবার অনেকে বলে জালে সিন্দুক উঠেছিল—গুপ্তধন ভরা সিন্দুক। যাই হোক, জেলে তখন শপথ করেছিল, বনবিবির পাকা মন্দির করে দেবে। সেই দুর্গম বাদায় পাকা মন্দিরের জন্য ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি, সিমেন্ট ইত্যাদি বয়ে আনার খরচ অনেক। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন ঝামেলাও অনেক। জেলে কিন্তু কোন বাধাকেই বাধা বলে মানেনি। মন্দির তৈরী করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে, সেবায়েত ব্যবস্থা করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে।

সৌকত আলীর সঙ্গে গল্প করতে করতে নারায়ণতলীর খাল বেয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁ-দিকের কাদায় বাঘের পায়ের টাটকা দাগ দেখে নৌকো

থামালুম। আবার দাগ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, আরও অনেক দাগ রয়েছে। বাঘটা সেই স্থানেই নিত্য খাল পারাপার করে। মাচা বাঁধবো বলে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখ পড়লো একটা মোটা গাছ জলের ঠিক কোল ঘেঁষে রয়েছে। গাছটার ওপর মাচা বাঁধলুম, নৌকোর দু'খানা তক্তা তার ওপর পেতে দিতেই একটা চমৎকার বসার জায়গা তৈরী হয়ে গেল। সেবারে আমার সঙ্গী ছিল মণ্টু ও বলরামবাবু। আমি মাচায় উঠে বসতেই ওরা খালের মুখে গিয়ে নৌকো বাঁধলো। আমি গাছের ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলুম। ক্রমে রাত হল, চাঁদের আলোয় সমস্ত বনটা ঝলমল করতে লাগলো। কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু সলুইদের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। তখন অনেক রাত, প্রায় বারোটা, হঠাৎ খালের ধারে ধপ্ ধপ্ শব্দ হতে লাগলো। শব্দটা কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে হচ্ছিল, আমি এর কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। গাছের পাকা তাল অনেক উঁচু থেকে কাদায় পড়লে যেমন আওয়াজ হয়, হুবহু সেই রকম আওয়াজ; অথচ কোথাও তাল বা ওই জাতীয় গাছ নেই।

আমি সিগারেটের টিন ও দেশলাই মাচার তক্তার ঠিক মাঝখানে রেখেছিলুম। তখন হাওয়া পড়ে গেছে, আমিও এতটুকু নড়াচড়া করিনি। হঠাৎ সিগারেট ও দেশলাই নীচে পড়ে গেল। যখনই কোন ব্যাপার আমাদের বুঝাবুঝির বাইরে চলে যায়, তখনই তাকে অলৌকিক বা ভৌতিক আখ্যা দিয়ে থাকি। আমার চতুর্দিকে এতক্ষণ ধরে যা-যা ঘটছিল, আমি তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলুম না। বলরামবাবুরাও খালের মুখ থেকে সেই শব্দ শুনেছিল। সৌকত আলি বললো, আরও একটা মজা দেখেছেন—সিগারেটের টিন ও দেশলাই জলে পড়ার কথা। কিন্তু দেখুন জলে পড়েনি, এমন কি কাদায়ও না, ঠিক পাশের শুক্‌নো জমিতে কে যেন আলতোভাবে রেখে দিয়েছে।

ভারতের অন্যান্য জঙ্গলে যে সব প্রথায় বাঘ শিকার করা হয়ে থাকে, সুন্দরবনে তা অচল। অসম্ভব কাদা ও গুলোয় ভরা সুন্দরবনের

জল-জঙ্গলে বিট্ বা হাঁকোয়া শিকার অসম্ভব। জলের শিকারও তাই, অর্থাৎ বাঘ যেখানে জল-পান করতে আসে তার আশে পাশে অপেক্ষা করা। সুন্দরবনে সর্বত্রই জল, বাঘ যেখানে খুসী জল পান করে। তবে মিষ্টি জলের যে কূপের কথা বলেছি, সেখানে অবশ্যই বাঘ যায়। এর পরে রইলো বেট্ বা টোপ শিকার। জীবন্ত টোপ তো এখানে কোথাও পাওয়া যায় না, সহর বা গ্রাম থেকেই তা বয়ে আনতে হবে। মৃত টোপ অর্থাৎ বাঘের মারা মড়ির ওপর বসতে হলে



তার সন্ধানে বনে টহল দিতে হবে। যদিও বা কোথাও মড়ির সন্ধান পেলেন, কিন্তু কর্দমাক্ত নালা বা খাল গতিপথ রুদ্ধ করে দেবে।

তা-ছাড়া আরও একটা মজার ব্যাপার আছে, আপনি যখন কর্দমাক্ত খালের ধারে দাঁড়িয়ে আফশোশ করছেন—হাতে গুলি ভরা রাইফেলটা নিস্‌পিস্ করছে, ঠিক তখনই ধূর্ত বাঘ আর একধার দিয়ে ঘুরে এসে আপনার নৌকো দেখবে, যদি আপনার অনুপস্থিতিতে কোন অসতর্ক মাঝিকে তুলে নিতে পারে। ঠিক এই রকমের ঘটনা যে কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই।

সেবার বাঘের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বকখালির ঠিক পিছনের একটা সঙ্কীর্ণ খালে প্রবেশ করে নোঙ্গর ফেলে দিলুম। খাল বিশেষ চওড়া নয়, নৌকোটাকে আড়াআড়িভাবে ঘুরিয়ে দিলেই খালের

বুকে চমৎকার এক সেতু হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দে এপার ওপার করা যায়। সকাল তখন আটটা, হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো টাটকা থাবার ওপর। একটা বাঘ কিছুক্ষণ পূর্বেই হয়তো আমাদের আসার মাত্র কয়েক মিনিট আগেই খাল পার হয়েছে। পূর্ব দিক থেকে এসে পশ্চিম দিকে গেছে। খালের কাদায় স্পষ্ট দাগ, তৎক্ষণাৎ আমি ও আমার সঙ্গী মণ্টু (সুনীল রায়) খাল পার হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁতালের বনে প্রবেশ করলুম। কাঁটা, কাদা কিছুই গ্রাহ্য করলুম না। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর চোখে পড়লো বাঘটা কাদার ওপর যেখানে বসেছিল কতকগুলো লোম সেই কাদায় লেপটে রয়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর বাঘটা ডানদিকের ঘাস বন পেরিয়ে বড় জঙ্গলে ঢুকেছে।

বাঘটাকে বেশীদূর যেতে দেব না মতলব করে দ্রুত একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে বড় জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। গুঁড়ি মেরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই শুকনো ডাল ভাঙ্গার একটা শব্দ হল আমাদের বাঁ-দিকে এবং কোনমতেই তা একশো গজের বেশী দূরে নয়। এরপর কিভাবে অগ্রসর হব যখন চিন্তা করছি, ঠিক সেই সময় কাদার ওপর লাফিয়ে পড়ার 'থপ্-থপ্' শব্দ হল, শব্দটা হওয়া মাত্রই সলুইয়ের উত্তেজিত ডাক শোনা গেল। বুঝতে পারা গেল বাঘটা কোন নালা পার হয়েছে এবং সেই সময় নালার উপর খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত সলুইরা আচমকা বাঘটাকে দেখতে পেয়েই ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

সলুইগুলো যে-ধার থেকে উড়ে আসছিল, আমরা সরাসরি সেই দিকে মাথা হেঁট করে ছুটলাম। নালার ধারে আসতেই কাদায় পুঁতে যাওয়া গভীর ছাপ দেখতে পেলুম। নালাটা দু-তিন হাত মাত্র চওড়া, কিন্তু কাদার স্তর আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঘটা তখন খুবই কাছে রয়েছে, হয়তো কোন গাছের ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখতেও পারে। কিন্তু নালাটা পার হব কেমন করে! বাঘটা যত সহজে তা পেরেছে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তখন বাঁ-দিকে আরও খানিকটা যেতেই নালাটা সরু হয়ে এল, প্রায় হাতখানেক কি হাত দেড়েক মাত্র চওড়া—কাদাও কম। সেইখানেই নালা পার হয়ে ওপারের

ঘন বনে প্রবেশ করলুম। চতুর্দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এক পা এক পা করে অগ্রসর হচ্ছি, কোথাও কোন শব্দ নেই, মাঝে মাঝে কাদার বাষ্প থেকে উদ্ভূত ফেনার পুঞ্জ ফেটে ভুট-ভাট শব্দ হচ্ছিল। আমরা পায়ের পাতা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কাদা কেটে হাঁটছিলুম, এ-ভাবে হাঁটলে বিশেষ শব্দ হয় না, পা পিছলে যাবারও সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু বাঘটার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না, কাদার ওপরও বাঘ বিশেষ শব্দ না-করে হাঁটতে পারে। সুতরাং দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, প্রথমতঃ সে আর কতদূরে রয়েছে, সে কি তখনও হাঁটছে! যদি তাই হয় তাহলে কোন দিকে! শেষের প্রশ্ন, যদি সে এখন না হাঁটে, তাহলে সে এখন কোথায়! আমার হাতে '৪৫০।৪০০ বোরের দো-নলা রাইফেল আর মন্টুর হাতে '৪২৩ বোরের মাউসার। তবু উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে এল। সুন্দরবনের ধূর্ত মানুষখেকোর পাল্লায় যাঁরা কখনো পড়েননি তাঁরা এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন না। কান পেতে রইলুম, কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি পাতার খস্‌খসানি বা জল কাদার অস্পষ্ট সামান্যতম ছপ্ ছপ্ শব্দও কানে এল না। চতুর্দিকেই হেঁতালের গুচ্ছ গুচ্ছ ঝোপ ছড়ান, খেঁজুর পাতার মত লম্বা লম্বা পাতাগুলো মাটির ওপর ঝুঁকে রয়েছে। বড় গাছের ছায়ায় ঝোপের তলাগুলো অন্ধকার, কোথাও আবার পাতার ফাঁক দিয়ে লম্বা এক ফালি রোদ এসে পড়েছে, আবার কোথাও লম্বা লম্বা পাতাগুলো শুকিয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। বেশীক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে ওঠে। নিজের চোখে দেখা বলে অন্যত্র কত জোর গলায় বলি, কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের চোখে দেখার ওপর থেকে সব আস্থা যেন চলে যেতে লাগলো। কেবলই মনে হতে লাগলো, ওটা কি! কি দেখলুম, বাঘ নয় তো! মন্টু তো কয়েকবার তড়িঘড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরলো, কিন্তু বাঘটা একটুও নড়লো না বা কোন ঝোপের তলা থেকে বেরিয়ে এলো না। ঝোপের তলাগুলো দেখতে দেখতেই প্রায় আধ-ঘণ্টা কেটে গেল।

বাঘটা এখানে নেই ভেবে যেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি অমনি একটা হরিণ ডেকে উঠলো। হরিণটা ডাকলো আমাদের সামনে প্রায় একশো হাত দূরে। বাঘ ও মানুষ উভয়কে দেখতে পেলেই হরিণ ডেকে ওঠে। এ ক্ষেত্রে হরিণটা আমাদের দেখে ডাকেনি, কারণ—আমরা তার অনেক পিছনে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে রয়েছি। অতএব হরিণের ডাকটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, ঝোপগুলোর তলায় আমরা বাঘের অস্তিত্ব সন্দেহ করে আড়ষ্ট হয়ে আধঘণ্টা সময় নষ্ট করেছি, বাঘটা সেখানে আদৌ নেই। সে তখন সামনের জঙ্গলে কোথাও ঘোরাঘুরি করবার সময় হরিণটার চোখে দৈবাৎ ধরা পড়ে গেছে। আর হরিণটা নিজের ও স্ব-জাতির প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে খবরটা আমাদের জানিয়ে দিল।

এখন আমাদের কাজ হল সোজা হরিণটার কাছে চলে যাওয়া এবং সে যেদিকে চোখ রেখে হুঁশিয়ারী ডাক ডাকছে, সেই দিকের বনে বাঘটার তল্লাসী করা। আবার কাদায় পা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হাঁটা শুরু করলুম। শব্দ যে একেবারেই হয় না তা নয়, কাদায় পুঁতে যাওয়া পায়ের পাতা টেনে তুললেই সামান্য গপ্ করে একটা আওয়াজ ওঠে, এ আওয়াজ ওঠে যখন হরিণ বা শুয়োর হাঁটে তখনও। হাওয়া না দিলেও ভিজে গাছ থেকে আর এক রকম শব্দ ওঠে—কট্ কট্। আচমকা এ শব্দ শুনেও চমকে উঠতে হয়। তাছাড়া কাদার ভুট্-ভাট্ শব্দের কথা তো আগেই বলেছি। হরিণটা খুব কাছেই রয়েছে, সুতরাং যাতে শব্দ না হয় সেইভাবে ধীরে সুস্থে গুঁড়ি মারতে লাগলুম। এতক্ষণ হরিণটা সমানে ডাকছিল, হঠাৎ সে ডাক বন্ধ করলো। যদিও তখন পর্যন্ত তাকে আমরা দেখতে পাইনি, তবু মনে হল বুঝি খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি।

হঠাৎ কাদার ওপর ছপছপ আওয়াজ হতেই তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়লুম এবং ঝোপের তলা দিয়ে দেখলুম চারটে পা। হরিণটা তড়বড় করে কয়েক কদম পিছিয়ে আমাদের পাশের ঝোপটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কান উঁচিয়ে সামনের দিকে

তাকিয়ে স্থির হয়ে রইলো। আর ঠিক সেই সময়ই দেখলুম, বাঘটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের একটা নালা লাফিয়ে পার হয়ে গেল। সেখান থেকেই দেখলুম নালাটা বেশ চওড়া, আমাদের পার হওয়ার সাধ্য নেই। এরপর বসে থাকার কোন অর্থ হয় না, উঠে দাঁড়াতেই দেখে ফেললো হরিণটা। আর এমন জোরে ডেকে উঠলো যে আমরা প্রায় চমকে উঠলুম। বাঘ দেখেও বোধ হয় অত জোরে ডাকেনি। বাঘের থেকেও সাংঘাতিক মানুষ দেখে বিদ্যুৎ গতিতে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সামান্য অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলুম বলখালির যে খালে আমরা নৌকো নোঙর করেছি, সেই খালের একটা পাশ-খাল বনটাকে ফুঁড়ে সজনেখালির গাঙে গিয়ে মিশেছে। বাঘটা নালা পার হয়ে যদি বাঁ-দিকের বনে যায় তাহলে অভয়ারণ্যে প্রবেশ করবে, আর যদি ডান দিকে ঘোরে তাহলে বলখালির বনেই আবার ফিরে আসবে খালের ডান পাড় দিয়ে।

আমরা যখন বনে ঘুরছিলাম সেই সময় নৌকো পাহারা দিচ্ছিলেন আর এক সঙ্গী অনিল দাস। আমরা ফিরতেই অনিল দাস খুব উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন, এই একটু আগে খালের ডান দিকের ঝোপের আড়ালে বসে একটা বাঘ পাতার ফাঁকে চোখ রেখে নৌকো দেখছিল। সেই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ নৌকোটাকে ঘুরিয়ে দিতেই সেতু হয়ে গেল, তীরে লাফিয়ে উঠে সেই ঝোপটার কাছে যেতেই দেখি টাট্‌কা দাগ। বাঘটা উপুড় হয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে নৌকো দেখছিল, বেলা তখন বারোটা।

এক্ষেত্রে বাঘটার সঙ্গে কোন মড়ি ছিল না, মড়ি থাকলেও সেই একই ব্যাপার ঘটতো। অনুসরণ করা হচ্ছে জানতে পারলেই বাঘ তার মড়ি লুকিয়ে কখনো শিকারীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পাতে, আবার কখন দ্রুত এক-চক্করে দেখে নেয় শিকারীর ঘাঁটি কোথায় অর্থাৎ খালের কোন জায়গায় তার নৌকো বাঁধা আছে। সুন্দরবনের বাঘ দিনে-রাতে সব সময়েই তৎপর, সব সময়েই সুযোগ পেলে শিকার করে।

টোপ্ শিকারের একটা সহজ উপায় আছে। তা হল, যে-কোন দ্বীপ থেকে একটা হরিণ বা শুয়োর মেরে আপনার নির্দিষ্ট দ্বীপে এসে নোঙর ফেললেন। বাঘ যদি তীরের কাছাকাছি কোথাও থাকে তো সে আপনার নৌকো দেখে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আড়াল নেবে এবং সে খবর আপনার জানবার কথা নয়, কারণ—সে আপনার আমার থেকেও বড় শিকারী! যাই হোক, বনে পৌঁছে টোপ্ শিকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনার নৌকোর সঙ্গীরা বন্দুক, দা, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে বনে নামবে ও কথাবার্তা বলতে বলতে বেশ খানিকটা অঞ্চল ঘিরে কাঠ কাটার অভিনয় করবে। সেই ফাঁকে আপনি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কাছাকাছি কোন পছন্দ করা গাছে রাইফেল, কিছু শুকনো খাবার আর জল নিয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। তখন নৌকোর অবশিষ্ট লোকেরা আপনার চিহ্ন করা গাছের ডালে সেই মরা শুয়োর (হরিণ বললে বন-বিভাগ ক্ষেপে যাবে) ঝুলিয়ে দেবে। তখন অভিনয়ের কাঠুরেরা দল বেঁধে নৌকোয় ফিরে এসে নোঙর তুলে দাঁড় বাইবে এবং কাছাকাছি অন্য কোন জায়গায় গিয়ে আপনার রাইফেলের আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করবে।

এখন বাঘ তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিল, লোকজন বনে নামতেই তার জিভে জল এসে গেল। কিন্তু লোকগুলোর হাতে চক্‌চকে বন্দুক, দা, কুড়ুল ও লাঠি-সোঁটা দেখে কিছু অস্বস্তি যে দেখা দিল না তা নয়, কিন্তু মানুষের মাংসের লোভ সামলান দায় (সুন্দরবনের বাঘ কিন্তু মোটেই ভদ্রলোক নয়), সে ক্রমশই জিভে জল ঝরাতে ঝরাতে পিছু হটতে লাগলো এবং গাছপালার আড়াল থেকে কাঠুরেদের ধরবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। নদীর চরে বা নৌকোয় তখন কি হচ্ছে কিছুই আর নজরে আসছে না। কাঠুরেদের যখন সে ধরতে পারলো না এবং যখন দেখলো নোঙর তুলে তারা চলে যাচ্ছে, তখন সে রাগে ল্যাজ সাপ্টাতে থাকবে এবং ক্ষ্যাপা কুকুরের মত নদীর ধারের বনে ছোটাছুটি করবে।

গাছের ডালে ঝোলান মড়ি নজরে পড়লেই স্থির হয়ে দাঁড়াবে,

ল্যাজে মৃত্থ মৃত্থ দোলা লাগাবে। বনে তখন কোথাও কোন শব্দ নেই, নীরব-নিস্তব্ধ বন তাকে বুঝিয়ে দেবে দ্বীপে কোন মানুষ নেই। অতীত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়বে কিনা জানি না, তবে ধীরে ধীরে সন্দেহ কেটে যাবে। কারণ এমন মড়ি দেখা তার অভ্যাস আছে সুন্দরবনের চোরাই-শিকারীদের কৃপায়। ক্ষুধার্ত লোলুপ বাঘ তখন পায় পায় এগিয়ে যাবে সেই টোপের দিকে, নাকটা বাড়িয়ে ঘ্রাণ নেবে—চতুর্দিকে তাকাবে, কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বনের শব্দ শুনবে। অত্যন্ত সতর্ক প্রাণী। মনে হবে এইবার বুঝি মড়ি টেনে নামিয়ে নেবে—কিন্তু না; বাঘের মত সন্দিগ্ধ প্রাণী আর নেই। এগোবে—পেছোবে, মড়ির দিকে তাকাবে আর ঘন ঘন কান নাড়বে, আবার নাক বাড়িয়ে গন্ধ শুঁকবে, কিন্তু ল্যাজের দোলা একবারও বন্ধ হবে না—সাপের মত কেবলই ঢেউ খেলছে। অনেক—অনেক পরে হঠাৎ এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়াবে, মড়িটাকে বাড়ানো ত্থটো থাবায় জড়িয়ে ধরবে—তখনও সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। চকিতে এবং ঝট্‌কায় মাটিতে থেমে দাঁড়াবে, লম্বা জিভ বার করে মড়ির ক্ষত থেকে রক্ত চাটতে চাটতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাবে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে মড়ি তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে বনের গভীরে।

এখন শিকারীর যদি মাচায় বসে বনের বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা থাকে আর নার্ভ শক্ত রেখে নির্ভুল নিশানায় গুলি ছুঁড়তে পারেন তো সেই বাঘের আর রেহাই নেই, লট্‌কে পড়তেই হবে।

পায়ে হেঁটে বাঘ শিকার সাধারণত কেউ পছন্দ করেন না, অনেকে ভয় পান। তবু আমাদের দেশে পায়ে-হাঁটা শিকারীর গুলি খেয়ে অনেক বাঘ মারা পড়েছে। একই জমিতে দাঁড়িয়ে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ভয়ানক ব্যাপার। বিশেষ সুন্দরবনের দলদলে কাদা ও শুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে এ লড়াই অত্যন্ত ত্বরূহ, একে বরং এক-তরফা লড়াই বলাই ভালো। ঘন বনের আড়াল থেকে অতর্কিত আক্রমণের যে সূচনা হবে, তার মোকাবেলা করতে শিকারীর যে-যে সুযোগ-সুবিধা থাকার একান্ত প্রয়োজন সুন্দরবনে তা নেই। অথচ এ বনের

বাসিন্দা সেই বাঘের প্রতিটি ইঞ্চি জমি চেনা, কাদা ও শুলোর ফাঁকে ফাঁকে অবলীলায় নিঃশব্দে হাঁটা এমন কি দৌড়ে যাওয়ার কৌশলও তার করায়ত্ত। বনের প্রতিটি ঝোপের অবস্থান, দ্বীপের বাঁক, নদীর ট্যাঁক, প্রতিটি নালা-পথ পারাপারের উপযুক্ত স্থান তার আজন্ম পরিচিত। অসম্ভব দ্রুতগতি, শব্দহীন পদসঞ্চার ও দুর্জয় সাহসের অধিকারী বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করতে শিকারী এ বন থেকে কোন সাহায্যই পাবেন না।

সম্পূর্ণ প্রতিকুল অবস্থায় শিকারীকে মুহূর্তেরও আগে তৈরী হতে হবে, ক্রুদ্ধ বাঘের আক্রমণকে প্রতিহত করতে অত্যন্ত জোরালো রাইফেল ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঘের আত্মগোপন করবার ক্ষমতাও অসাধারণ। তার চামড়ার রঙের বৈশিষ্ট্যে রোদ-লাগা সামান্য ঝোপই যথেষ্ট। লক্ষ্য রাখবার বিষয় মানুষখেকো বাঘও মন্থর গতি নড়বড়ে মানুষকে ভয় পায়, যদিও বিকৃত-রুচির জন্য মানুষ তার খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দিনের আলোয় সে নির্ভয়ে লাফিয়ে পড়বে জেলে-ডিঙ্গির উপর, কিন্তু অস্ত্রধারী শিকারীকে দেখলেই চোরের মত লুকোচুরি খেলবে। বাঘ স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ ধরে, যেমন ধরে বনের অন্যান্য পশুদের, পিছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়াই তার চিরাচরিত অভ্যাস। বাঘের মত মানুষেরও ঘ্রাণ-শক্তি নেই বললেই হয়, তবুও বাঘ বাতাসের বিপরীত দিক থেকেই মানুষকে অনুসরণ করে। হয়তো সে নিজের গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে সচেতন, তাই বাতাসের সাহায্য নেয়।

শিকারী যখন রাইফেল উঁচিয়ে বাঘের পায়ের-ছাপ অনুসরণ করেন, তখন বাঘ ঠিক বুঝতে পারে যে তাকে লক্ষ্য করেই বাদার শব্দ তুলে, শুলোর হোঁচট্ খেয়ে যে নড়বড়ে মানুষটা এগিয়ে আসছে—সে বিপজ্জনক। তখন চতুর বাঘ হয় কোথাও ওৎ পেতে অপেক্ষা করে, আর না-হয় পথ পরিবর্তন করে করে শিকারীকে হয়রান করে ফেলে এবং শেষে এমন এক ধোঁকার সৃষ্টি করে তখন শিকারী বুঝতেই পারেন না, বাঘটা সেই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে। শিকারী যদি আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পড়েন, তাহলেই বুঝতে পারবেন বাঘের থাবা ধরে একই পথে

তিনি গোল হয়ে ঘুরছেন এবং সেই ভয়াবহ বৃত্তটা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। আপনি যখন সামনে বাঘ খুঁজছেন, সে তখন আপনারই পিছনে লাফাবার জন্য লোলুপ হয়ে রয়েছে।

নরখাদকরা সচবাচর সামনা-সামনি আক্রমণ করে না। সেইজন্য বাঘের পিছু নিতে হলে সব সময়ই তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে পিছনের-দিকে। হাওয়ার অনুকূলে থেমে-থেকে হাঁটা উচিত, নজর সব-দিকেই থাকবে কিন্তু পিছনটাই বেশী বিপজ্জনক। শিকারী যদি অত্যন্ত উত্তেজিত না হন, তাহলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও পেতে পারেন। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় মনকে আমার মত সচেতন করে ও আশু বিপদের পূর্বাভাস দেয়। শিকারী যদি বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন অথবা আস্থা হারিয়ে বসেন, তাহলে জলের দিকে পিছন রেখে ঘন-ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, জলপান করে অথবা কোন শক্ত জিনিষ চোয়ালের নীচে চিবিয়ে রাখবেন। যথা—চকোলেট, লজেন্স ইত্যাদি। এতে উত্তেজনাব উপশম হয়। এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ বাঘের পিছু নিলে দিশেহারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আব স্নায়ু-যন্ত্রগুলোও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অসুস্থ শরীব, ভারাক্রান্ত মন বা রাগ নিয়ে কখনও জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নয়।

শিকারীরা সাধারণতঃ অক্টোবর থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জঙ্গলে আসা-যাওয়া করেন। যখন মৌলীরা আসে তখন কদাচিৎ শিকারীর নৌকো চোখে পড়বে, সুতবাং বিলম্বে আসা মৌলীরা শিকারীদের বিশেষ সাহায্য পায় না। কাঠুরেরা যখন বনে কাঠ কাটে, কিম্বা মেয়েরা নদীর তীরে উঠে জাল শুকোতে দেয় অথবা টানাজালের দড়ি বাঁধার জন্য ডাঙ্গায় ওঠে, খালের-মুখে যখন মাথা ঘুরিয়ে জেলেরা ঘুরনী-জাল ফেলে, ঠিক সেই অসহায় মুহূর্তগুলো নরখাদকরা কাজে লাগায়। এত নিঃশব্দে মানুষটা উধাও হয়ে যায় যে, দলের হতভম্ব মানুষগুলোর চিন্তা-শক্তিও যেন তার নাগাল পায় না। শিকারীরা সন্ধানে থাকলে এ-রকম বিপদগ্রস্ত দলের কাছে দ্রুত পৌছতে পারেন ও চেষ্টা করলে মৃতদেহ বহনকারী সেই বাঘের

সান্নিধ্যে আসা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বন-বাদাড়ে বাঘের থাবা মৃতের ক্ষত থেকে চুইয়ে-পড়া রক্তের দাগ অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মানুষ পিছু নিয়েছে জানতে পারলে ক্রুদ্ধ বাঘ গলা খাঁ্যাকারী দিয়ে নিজের অবস্থান প্রকাশ করে ফেলে। এ-তে শিকারীর নার্ভ যদি ঠিক থাকে তো সেই বাঘকে মেরে ফেলা বিশেষ দুঃসাধ্য নয়।

অনেক সময় বাঘ মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে চুপিসারে সন্ধানকারীর তল্লাসে আসে, সেই সময় বাঘের রক্তমাখা বিস্ফারিত মুখে যে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে, শিকারী তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন না।

প্রচণ্ড চিৎকার করে রুখে দাঁড়াতে পারলে অনেক সময় বাঘের আক্রমণ থামান যায়, আশা করি কোন শিকারীই সে পরীক্ষা দিতে রাজী হবেন না। মোট কথা—বাঘ মানুষকে ভয় পায়, যদিও মৃতদেহ ভক্ষণে তার আপত্তি নেই। রুখে দাঁড়ান জ্যান্ত-মানুষটার প্রতি তার হৃদয়-বৃত্তের কোথায় যেন ভয়ের একটা ঘর রয়েছে। পাকিস্থানী শিকারী তাহাওয়ার আলি খান বলেছেন—বাঘ মৃতের কাচের মত স্বচ্ছ আতঙ্কিত চোখের স্থির দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না...একথা যদি সত্য হয়, তা'হলে বলা যেতে পারে—বাঘ প্রকৃতপক্ষে ভয় পায় রুখে দাঁড়ান মানুষের স্থির-দৃষ্টি, না তার অন্তর্নিহিত আব কিছু...!

বাঘের চলাচলের পথ খুঁজে বার করে নিয়মিত ভাবে বসতে পারলেও তাব দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

সেবার আমি ও আমার সঙ্গী মণ্টু (সুনীল রায়) দু'জন মাঝি সঙ্গে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা ন্যাড়া গেমো-গাছে উঠে বসলাম সন্ধ্যার ঠিক পূর্বেই, উদ্দেশ্য একটা বরা মেরে বাঘের জন্য টোপ্ দেওয়া। মাঝিদের এনেছিলাম বরাটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ধীরে ধীবে সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসতে লাগলো, তবু বরার দেখা পাওয়া গেল না, অথচ পথটায় বরার অসংখ্য পদ-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তেঁতুলে-খালের যথেষ্ট বদনাম আছে, তবুও শীতের সন্ধ্যায় বনের রাজার ভেট সংগ্রহে ন্যাড়া গেমো-গাছটার শুকনো ডালে বসে উত্তরের হাওয়ায়

কাঁপতে লাগলুম। আমাদের গাছটার ডান পাশে ছিল লম্বা একটা ঘাসের বন, আর বাঁ পাশে এক-রাশ গোলপাতার ঝাড়, যার তলায় তখন অন্ধকার ঘন হচ্ছিল ওৎ পেতে থাকা শিকারী-জন্তুর মত। গেমো-গাছটার চার হাত পিছনেই ছিল সেই দুর্লভ তেঁতুল গাছ, যা ওই অঞ্চলে আর কোথাও দেখিনি।



এই তেঁতুল গাছটার জন্যই খালের নাম তেঁতুলে-খাল। খালের নির্জন চরে মানুষ-পড়ার অনেকগুলো নিশানা টাঙ্গানো ছিল। তেঁতুল তলাটা শুকনো লাল পাতায় চাপা, তার ওপর গজিয়ে উঠেছিল ল্যান্টানার একটা কাঁটা-ঝোপ। আসন্ন-সন্ধ্যা, তখনও দৃষ্টিশক্তি

বিশেষ ব্যাহত হচ্ছিল না, এমন সময় পিছনের জঙ্গলে খুট্-খাট্ শব্দ হল। আমরা ভাবলাম বুঝি বরা আসছে, যে পথে বরার বেরিয়ে আসবার কথা—আমরা সেইদিকে নজর ফিরিয়ে রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও বরা এল না, এদিকে শীতের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসছিল, খুট্-খাট্ শব্দটা ওই একবার মাত্র শুনতে পেয়েছিলাম।

এমন সময় ঠিক আমার পিছনে শুকনো তেঁতুল-পাতা গুঁড়ো হওয়ার মত মচ্-মচ্ স্পষ্ট আওয়াজ হল। শব্দটা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি ছিলাম গাছটার একদম গোড়ার কাছে, যেখানে একটা মোটা ডাল মাটির সমান্তরালে বেড়ে উঠেছিল। যার অর্ধেকটা কাঠুরেরা হয়তো কেটে নিয়ে থাকবে। আমি চেয়ারে বসার ভঙ্গিমায় সেই দো'ডালার ফাঁকে বসে পিঠটা মূল গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখেছিলাম, আর পা দুটো ছিল মাটি থেকে মাত্র হাতখানেক উপরে। মণ্টু ও মাঝি দু'জন গাছের প্রায় সাত-আট হাত উপরে বসেছিল। ওরাও শুনতে পেয়েছিল শব্দটা। আমি দ্বিতীয়বার শব্দটা শোনবার অপেক্ষায় রাইফেলটা নিয়ে ঘুরে বসলাম। আর ঠিক তখনই আবার পরিষ্কার শুনলাম, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে তেঁতুলপাতা গুঁড়ো করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত সাবধানীর মত মৃদু আওয়াজটা প্রায় ল্যানটানার ঝোপের কাছে এসে থেমে গেল, কিন্তু ঘন ঝোপটার আড়াল পড়ায় সেই সময় কিছুই দেখতে পেলাম না। তেঁতুল-তলায় সে এসে হাজির হয়েছে—সে যে তেঁতুলে-খালের সেই কুখ্যাত মানুষখেকো, তা বুঝতে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না! আমি ডালটা আঁকড়ে ধরে কাঠবেড়ালীর মত সর্-সর্ উঠে গেলাম একেবারে মণ্টুর পাশে।

এতটা উপরে উঠেও কিন্তু বাঘটাকে দেখতে পাইনি। এমন সময় ঘাস-বনের পাশ থেকে আরও একটা বাঘ এসে প্রথমটার সঙ্গে যোগ দিল। দ্বিতীয় বাঘটা যখন পিছনের ঝোপটা বেড় দিচ্ছিল, সেই সময় একজন মাঝি তার কোমরের খানিকটা অংশ দৈবাৎ দেখতে

পেয়েছিল। লোকটা প্রায় চিৎকারই করে উঠতো, যদি না মণ্টু ওর মুখ চেপে ধরতো। তখন মাঝিরা কোমরের গামছা খুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের বেশ ক'ষে বেঁধে ফেললো, এই কাজ শেষ হতে-না-হতেই বনে অন্ধকার নেমে এল, কিছুই তখন আর দেখা যাচ্ছিল না।

মাঝিরা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল, ওরা ভাবছিল হয়তো সারারাতই এভাবে গাছের ডালে বাঘেদের নজরবন্দি হয়ে বসে থাকতে হবে। সেই ঘোর অন্ধকারে জোড়া বাঘের কবল থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব ব্যাপার। বাঘ দুটো সেই যে ঘাপটি মেরে বসে রইলো আর নড়লো না, এমন কি শুক্‌নো পাতার কোন খস্‌খসানিও কানে এল না—পাকা মানুষখেকোর এই বিশেষত্ব। বেলাবেলি ফিরবো ভেবে গরম জামা আনিনি, তাছাড়া দু-ব্যাটারীর একটিমাত্র টর্চ ছাড়া আলোর আর কোন ব্যবস্থা সঙ্গে ছিল না। এ হেন পরিস্থিতিতে করণীয় কিছুই খুঁজে না পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে শীতে শুধু কাঁপতে লাগলুম।

আমি একা হলে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু মাঝিরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, ওদের একজনের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। তখন সেই দু-ব্যাটারী টর্চের স্বল্প আলো ফেলে বনের দিকে তাকিয়ে রইলুম, কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। আশা করেছিলুম আর কিছু না হোক, আলোর আভায় বাঘের চোখ হয়তো চিক্‌চিক্ করে উঠবে, তাহলেই গুলি করারও কিছু সম্ভাবনা দেখা দেবে, কিন্তু তাও হল না। বাঘ দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে, এদিকে মাঝিরা অসহায়ের মত কেবলই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ওদের ওপর আমার একটা দায়-দায়িত্ব রয়েছে। মণ্টুকে বললাম, রাত ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে—এ রাতে যদি ফিরতে হয় তাহলে এখুনিই তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝিদের নির্দেশ দিলাম কোমরের গামছা খুলে নিতে।

তারপর একজন মাঝির হাতে টর্চ দিয়ে বললাম, ল্যানটানার ঝোপে আলো ফেলতে। ইতিমধ্যে মণ্টু ও আমি উভয়েই তৈরী হয়েছিলুম, একসঙ্গে রাইফেলের ঘোড়া টিপে দিলুম ঝোপ লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে ঝোপটা দুলে উঠলো, তারপর থপ-থপ

আওয়াজ করে শুকনো পাতা ও ডাল-পালা দুলিয়ে সশব্দে বাঘ ও বাঘিনীর দৌড়ে পালানোর স্পষ্ট আওয়াজ শুনলুম। গাছ থেকে দ্রুত নেমেই আরও দু-রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে দিলুম, তারপর বনের দিকে চোখ রেখে নৌকোয় ফিরে এলুম।

অনেকে 'বাঘের-ডাক' ডেকে বাঘ শিকার করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঘ-শিকারী জিম করবেট বিশেষ প্রয়োজনে বাঘের-ডাক নকল করে শিকার করতেন। মুখের দু'পাশে হাত চাপা দিয়ে লম্বা দম নিয়ে হাঁক পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু যাঁদের গলার স্বর গম্ভীর ও মোলায়েম নয়, তাঁদের পক্ষে ডাক নকল করা সম্ভব নয়। কারণ—বাঘের মেটিং-ক'ল্ মোলায়েম, কিন্তু অসম্ভব গম্ভীর ও দূর-প্রসারী। সেই কারণে মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বা তারের সাহায্যে নকল শব্দ পাঠানোর পদ্ধতি সুন্দরবনে আছে। এতে প্রতিধ্বনি জোরালো হয় এবং অন্যমনস্ক বা বিশেষ আগ্রহী বাঘ বা বাঘিনী সে ডাকে সাড়াও দেয়।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে ডেকে বাঘ শিকার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ—উদগ্র কামনায় উন্মত্ত বাঘ-বাঘিনীর তখন বিশেষ হুঁশ থাকে না, সরাসরি ঘাড়ের ওপর এসে হাজির হয়। তখন এক গুলিতে তাকে মেরে ফেলতে না পারলে মৃত্যু—অনিবার্য্য মৃত্যু—!

যদি এভাবে ডেকে বাঘ শিকার করতেই হয়, তাহলে মাটিতে বসেই ডাক পাঠানো শ্রেয়, কারণ—মাটিতে প্রতিধ্বনি যেমন জোরালো হয় তেমনি বাঘেরও সুবিধা হয় শব্দের উৎপত্তি-স্থল দ্রুত খুঁজে নিতে। সে তখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে খানা-খন্দ, পাথর-ঢিবি ডিঙিয়ে লাফিয়ে দূরত্ব সংক্ষিপ্ত করবার জন্য পথ-অপথ গ্রাহ্য না করে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে আসে। সুন্দরবনে বড় গাছের অভাবে শিকারীর পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তবু শিকারীর যদি নিজের ওপর এবং রাইফেলের ওপর সমান আস্থা থাকে, তাহলে শীতকালে সুন্দরবনে ডাক পাঠিয়ে আনন্দ-লিপ্সায় উন্মত্ত বাঘিনীকে আপনার কোলের কাছেও টেনে আনতে পারেন। কিন্তু তার আগে শিকারীর উচিত মৈথুন-ঋতুতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বাঘের মেটিং-ক'ল্ মনোযোগ দিয়ে

শোনা ও স্বরগম মনে রাখা এবং গলা পরিষ্কার ও মোলায়েম রাখার জন্য বিশেষ চিকিৎসকের পরামর্শে চলা।

মনে করুন, গভীর বনে গিয়ে গোঁফে চাড়া মেরে দিলেন একটা হাঁক পাঠিয়ে, যাকে বলে সেই দারুণ রোমান্টিক মেটিং-ক'ল্! এইবার সেই ডাক শুনে সাড়া দিতে দিতে অভিসারে আসবে বাঘিনী। আপনি জানেন না কোন কুঞ্জ থেকে সে উন্মাদিনীর মত ছুটে আসছে। আপনার যেমন বুক কাঁপছে, তারও বুকে তেমনি গুরু-গুরু ধ্বনি ধক্ ধক্ করছে। অত্যন্ত নিকটে না আসা পর্যন্ত তার চকিত চরণ-ধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না। তারপর হঠাৎই এক সময় সবিস্ময়ে আবিষ্কার করবেন বাঘিনী একেবারে আপনার নাকের ডগায় এসে হাজির। আপনি হয়তো খেলার ছলে তাকে ডেকেছেন, কিন্তু সে আপনার ডাক শুনে এক গভীর প্রত্যয় নিয়ে এক বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে ছুটে এসেছে। যখন অবাক হয়ে আপনার চোখে চোখ রেখে সে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, তখন আপনার যত ভাবের উদয়ই হোক না কেন, প্রাণের তাগিদ এমন করে আর কখনো অনুভূত হয়নি এ প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে চক্ষের নিমেষে একটি মোক্ষম গুলি নিখুঁত নিশানায় যদি নিক্ষেপ করতে না পারেন—তাহলে সুন্দরীর (সুন্দরবনের বাঘিনীর) দৃঢ় আলিঙ্গনে বাদা-বনের নোনা মাটিতে আরও একটি বিয়োগান্ত কাহিনী রক্তের আঁচড়ে সবার অলক্ষ্যে লেখা থাকবে।

সুন্দরবনের বাঘের সম্বন্ধে একটা নূতন খবর শোনাতে পারি, যা ভারতের অন্যান্য জঙ্গলের বাঘেদের আচরণে কখন কখন ঘটেছে বলে শুনিনি। সুন্দরবনের বাঘের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি অত্যন্ত গোপনীয়। সুন্দরবনের বাঘ মধু খায় আর নাচে! হ্যাঁ নাচে! রাস্তায় ডুগডুগির তালে-তালে যেমন ভালুক নাচে ঠিক তেমনি। ব্যাপারটা দেখেছিল আমার বন্ধু বুড়ো ভুলো শিকারী। সুন্দরবনের মধুর চাকগুলো যখন ভারী হয়ে ঝুলে পড়ে অথচ কোন মৌলী তখনও সেই দ্বীপে আসেনি, তখন বাঘ সেই মধু পাহারা দেয়। মৌলীর আশায় দিন

শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে ওঠে, সহসা কি খেয়ালে খানিকটা চাক্ কামড়ে ভেঙে নিয়েই ভোঁ দৌড় দেয়, কিন্তু ক্রুদ্ধ মৌমাছিরা তা-বলে রেহাই দেবে না প্রকল্পের রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে। দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রকাণ্ড ডোরা-কাটা দেহটার উপর, তারপর চলে হুল্ ফোটানোর পালা। বিষের জ্বালায় জর-জর বাঘ তখন চোখে সরষে-ফুল দেখে। কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে শুরু করে দেয় ধেই ধেই নাচ। তারপর প্রাণের দায়ে ঝপাং করে খালের জলে লাফ দিয়ে পালায় ওপারে।

কাছাকাছি একটা গাছে চুপিসারে বসেছিল বুড়ো ভুলো শিকারী তার পেলামোকে নিয়ে। ভুলো বাঘও মেরেছে, সেদিন এক-নলা বন্দুকটায় একটা এল. জি. গুলি ভরে চুপ মেরে বসেছিল হরিণের আশায়। যে সব পাতা ভেসে এসে কাদায় আটকে যায়, হরিণ ঝোপের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে দেখে, তারপর কান ঘুরিয়ে শব্দ শোনে, শেষে নাক ফুলিয়ে ঘ্রাণ নেয়। এত কাণ্ডের শেষে গুটি-গুটি করে এগিয়ে আসে জলের কিনারায় পাতা খেতে। বনের নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখে বন-ঘুঘু ভুলো শিকারী, ঠিক তাল বুঝে বসেছিল ঘাপটি মেরে। এমন সময় পাতার সর-সর শব্দ করে বেরিয়ে এসেছিল হরিণের পরিবর্তে বাঘ, খালের ধারে অস্থিরভাবে পায়চারি করে ভুলোরই গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসলো কুকুরের মত। প্রমাদ গুনলো ভুলো-শিকারী, পাথর হয়ে বসে রইল পেলামোর হাত ধরে। কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হয়েছিল মনে নেই, যখন ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে শিরায় টান ধরেছিল, তখনই বাঘটা আবার জঙ্গলে ফিরে গেল। ভুলো ও তার পেলামো এতক্ষণ ভয়ে দম পর্যন্ত ফেলতে পারেনি।

এমন সময়ই ঘটে মাংসাশী বাঘের এ-হেন বেহেড্-কাণ্ড। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে ভাঙ্গা চাকটা মুখ থেকে ফেলেই রদ্দারদ্দি করে শুরু করলো কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, তারপরই শুরু করে দিল বেতালা-নৃত্য গাঁ গাঁ শব্দ করে। অভিজ্ঞ ভুলোর বুঝতে আর

বাকি ছিল না, সাইজ করবে কি! হেসেই খুন, গড়িয়ে পড়ে আর কি গাছের-ডাল থেকে, বলে—দেখ, শালা চোরের কীর্তি। শালা আবার জঙ্গলের রাজা! রাজা ততক্ষণে পগার-পার।

সুন্দরবনে আজ পর্যন্ত যত বাঘ মারা পড়েছে তার শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ এই গাছাল-শিকারেই সম্ভব হয়েছে। কি-বা দিন, কি-বা রাত—বাঘ প্রায় সব-সময়ই বনের পথে হাঁটে। দ্বীপের চৌহদ্দি টহল দিয়ে বেড়ায়, সন্ধান করে কোথায় কোন নৌকা এসে ভিড়লো, কোন বনে মানুষ নেমেছে। আমি সকাল ছ'টায় দেখেছি বাঘ হেঁটেছে, সেই দাগ মুছে দিয়ে আবার দেখেছি—সে হেঁটেছে বেলা এগারটা থেকে-বারোটার মধ্যে, তারপর বিকাল তিনটেয়। সাড়ে-পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে তার পায়ের ছাপ আবার পড়তে দেখা গেছে, তারপর সারা-রাত তো সে চলে বেড়ায়—সকাল ছ'টায় আবার দেখবেন তার ফিরে যাওয়ার নতুন দাগ। এখন গাছাল শিকার করতে হলে প্রথমেই সন্ধান করতে হবে বনের গভীর অঞ্চলে তার চলাচলের পথ এবং সেই পথের ধারে কোন গাছে হঠাৎ উঠে পড়তে হবে এতটুকু সাড়া-শব্দ না করে। তারপর চলবে আপনার ধৈর্যের খেলা ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ধরে, হাতে পায়ে খিল্ ধরে যাবে, কোমর ব্যথায় টন্-টন্ করবে, আর উত্তেজনা! উত্তেজনায় পাগল হওয়ার উপক্রম হবেন। তারপর রাত্রে আছে মশার কামড়, আর ঠাণ্ডা—সারা-রাত মাথার উপর ঝরবে শিশির বিন্দু টপ্‌টপ্ করে। ভিজে রাইফেলের নল তখন বরফের মত ঠাণ্ডা। দীর্ঘসময় অতি-বাহিত করবার জন্য আপনার প্রয়োজন শুকনো রাখার ও বোতল ভর্ত্তি জল বা গরম চা।

এত কাণ্ডের শেষে যদিও বা বাঘ পেলেন, তাকে থামাবেন কি করে? তাকে থামাবার জন্য তো কোন টোপ যোগাড় করতে পারেননি, মুহূর্তের মধ্যে নিশানা নিয়ে যদি সেই চলমান দেহের ভাইটাল পয়েন্টগুলি বিদ্ধ করতে না পারেন, তাহলে অবশ্য কান্নার কাছে ভবিষ্যতের সুযোগ নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন না! সে-ক্ষেত্রে বসে-বসে

বাঘ দেখাই ভাল। কখন দেখবেন লাফাতে লাফাতে আপনার গাছ তলা দিয়ে চলে যাচ্ছে, নয়তো বিদ্যুৎ বেগে কোন জন্তুকে ধাওয়া করে চলেছে। আবার কখন দেখবেন গুঁড়ি মেরে আপনারই গাছতলায় চলে আসছে, সে ক্ষেত্রে তার সন্ধানী দৃষ্টি হয়তো আপনারই উপর নিবদ্ধ। আবার হয়তো দেখবেন হরিণ বরা মুখে ঝুলিয়ে আপনার গাছতলা দিয়ে চলে গেল, নয়তো মাচার অদূরে বসে খাওয়া শুরু করলো। তখন আপনার চোখ তো তৈরী হয়ে গেছে, অভিজ্ঞতার শূন্য ঝুলিটাও ক্রমশ ভারি হতে আরম্ভ করেছে—অতএব মাভৈঃ বলে টিগার-টিপে দেবেন। সুন্দরবনে হরিণ মারা নিষিদ্ধ, চোখের উপর বাটপাড়ী করার মতো কিছু বাড়তি লাভ আপনার তো হবেই? মুখ-বদলাবার এমন বাড়তি সুযোগ নিশ্চয়ই হেলায় হারাবেন না!

আমি কয়েকটা ঘটনা শোনাচ্ছি, তা থেকেই বুঝতে পারবেন গাছাল শিকার কিভাবে সম্ভব। একবার ষ্টোর-খালির জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছি, তখন সকাল ন'টা। হঠাৎ এক জেলে-নৌকোর সঙ্গে দেখা। নৌকোর গায়ে নৌকো ভিড়িয়ে বনের খবরাখবর করা হল, তারপর এল মাছের কথা। জেলেরা বললো, গাঙ্গে সে বছর মাছের আমদানি কম, যাওয়ার সময় কিছু মাছ আমাদের দিয়ে গেল খাওয়ার জন্য। বড় পারশে ও গুড়-জাউলী—রূপোর মতো চক্চক্ করছিল ওদের চেহারা।

রান্নার কাঠ ফুরিয়ে গিয়েছিল, খালের ধারে একটা শুকনো গাছ দেখে মাঝিরা নৌকো বেঁধে ডাঙ্গায় নামলো কাঠ কাটার জন্য, মণ্টু রাইফেল হাতে ওদের পাহারায় রইলো, আর আমি রাইফেল নিয়ে নৌকোর মাথায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় ওরা আমায় ডাকতেই তাড়াতাড়ি কাদা ভেঙ্গে ডাঙ্গায় উঠে সেই শুকনো গাছটার কাছে আসতেই দেখতে পেলাম, গাছটির নীচে হরিণের হাড় ও পায়ের খুর আর এক রাশ লোম পড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা আঁচ করতে সময় লাগলো না। বাঘ এই গাছের নীচে বসে হরিণ খেয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র তিন চার দিন পূর্বে, তখনও হাড়ে কাঁচা-মাংস লেগেছিল,

নাড়ী-ভুঁড়ির দলাটা অল্প একটু দূরেই পাওয়া গেল। জায়গাটা বিপজ্জনক, অতএব খুব তাড়াতাড়ি করে কাঠ কাটা সাঙ্গ করে আবার নৌকো ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন ভাঁটার টানে জল নেমে যাচ্ছে।

খালের শেষ মাথায় পৌঁছে একটা ভারা-গাছের মোটা শিকড়ে নৌকা বেঁধে রান্নার ব্যবস্থা করা হল। নৌকাটার যে দিকটা চরে ঠেকে রয়েছে সেইখানে আমরা রাইফেল হাতে পাহারায় বসলাম, তখন দু'জন মাঝি ডাঙ্গায় নেমে মাছ কুটতে লাগলো। বাসন-পত্র ধোঁয়ার শব্দ ও কথাবার্তা সবই চলছিল খুব স্বাভাবিক নিয়মে। দিনটা ছিল চমৎকার, তার উপর এতগুলো মাছ পাওয়া গেছে, তখন স্ফূর্তি আর দেখে কে! কিন্তু তা বলে আমরা এতটুকু অসতর্ক হইনি, যারা নীচে নেমে মাত্র দু'হাত দূরে মাছ কুটছিল, তাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা তৈরী হয়েই বসেছিলাম। ভাঁটার টানে জল হু-হু-করে নেমে যাচ্ছিল। জোয়ারে বনের মধ্যে যে জল প্রবেশ করেছিল, সেখানেও টান ধরেছে, তখনও তিন-চার ইঞ্চি জল জমেছিল।

এমন সময় নৌকোর খুব কাছের একটা ঝোপ থেকে ছপ্-ছপ্ শব্দ হল, ঠিক কেউ যেন জল কাদা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কয়েক-সেকেণ্ডের মধ্যেই শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। ব্যাপাটার অনুসন্ধান করবার জন্য তৎক্ষণাৎ আমি ও মণ্টু বনে নেমে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিলুম। ঝোপটার কাছে এসে দেখি বাঘ যে বসেছিল, তার সব চিহ্নই সেখানে তখনও বর্তমান। তারপর বাঘটা যেদিকে হেঁটেছে, সেই থাবার গর্তেও জল ঢুকে ফেনা উঠছে। নৌকা একটু বেশী জলে নিয়ে যেতে বলে আমরা বাঘটার পিছু নিলাম, তারপর শুরু হল সেই জল-কাদা ভাঙ্গা। সেই একই রকম ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠতে লাগলো প্রতি পদক্ষেপে। প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর দেখা গেল, বাঘটা একটা নালা পার হয়ে সেইদিকে যেখানে হরিণের লোম পড়ে থাকতে দেখেছিলুম, সেই পথে ফিরে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল, বাঘটা কি আগে থাকতেই ওখানে জল কাদার

মধ্যে শুধু শুধু বসে নদীর শোভা দেখছিল ? না, যেখানে আমরা কাঠ কাটছিলাম তারই কাছে-পিঠে কোথাও বিশ্রাম করছিল! কাঠ কাটার শব্দই ওকে আকৃষ্ট করে কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটেই যে কাঠ কাটা শেষ হবে, এ-কথা হয়তো বেচারী বুঝতে পারেনি। তাই কাঠ কাটার জায়গায় এসে যখন দেখলো লোকজন সব নেমে গেছে আর নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে, তখন রাগে ওর লোম ফুলে উঠলো, শিকার ফস্‌কে যাওয়ার আক্রোশে ফুঁস্‌তে ফুঁস্‌তে নৌকোর সমান্তরালে হেঁটেছে বনের পথে। এতটা পথ সে এসেছে নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে, অথচ একবারও আমরা তার উপস্থিতি বা কোন শব্দ পাইনি! যখন ভারা-গাছে নৌকো বাঁধা হচ্ছিল, ঠিক সেই সুযোগে দ্রুত পা চালিয়ে নিকটবর্তী ঝোপটার আড়াল নিয়েছিল। যখন মাঝি দু'জন ডাঙ্গায় নামলো মাছ কুটতে, তখন সে স্ফূর্তিতে গোঁফে চাড়া দিয়েছিল কি-না জানি না, তবে আমার ও মণ্টুর হাতের রাইফেল দুটো ওর বাড়া ভাতে যে ছাই দিয়েছিল—সে কথা আমি হলপ্‌ করে বলতে পারি।

বেচারা যখন দেখলো শীতের পোষাক পরা সশস্ত্র লোক দুটো বাঘ মারা কল্‌ দুটো নিয়ে সিগারেট ও খৈনীর শ্রাদ্ধ করতে বসলো তো বসলোই, একবারও জায়গা ছেড়ে নড়লো না, বা বনের উপর থেকে নজর সরিয়ে নিল না, তখন অযথা মরীচিকার পিছনে না ছুটে অন্যত্র চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করে চটপট সরে পড়লো। তাও আবার এমন কৌশলে গেল যে নিদেন-পক্ষে একটা যে গুলি ছুঁড়বো সে সুযোগও রইলো না। বুঝুন, যখন সে এসেছিল একবারও তার পায়ের শব্দ হয়নি, কিন্তু যখন হতাশায় ফিরে গেল, তখনই উঠেছিল দুপ্‌ দুপ্‌ শব্দটা। বনে মানুষ নামলে বাঘ কি ভাবে তার সন্ধান করে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। যদি গাছে কোন শিকারী লুকিয়ে থাকতেন, তা'হলে এই বাঘকে মেরে ফেলা কি খুব কঠিন হ'ত ?

আর একটি ঘটনা। একবার একদল কাঠুরে বনে গেল কাঠ কাটার জন্য। নৌকো যখন তীরে এসে ভিড়লো তখন ভাঁটার জল

নেমে যাচ্ছে। জোয়ারের সময় বনে যতদূর পর্যন্ত জল ঢুকেছিল, ভাঁটার টানে অসংখ্য ঝরণার মত তির্ তির্ করে নেমে যাচ্ছিল গাঙের বুকে সেই জল। অসংখ্য পারশে মাছ সেই জল কাদায় কিল্‌বিল্ করতে করতে স্রোতের সঙ্গে নেমে আসছিল, তাই না দেখে ওরা আনন্দে হৈ-হুল্লোড় লাগিয়ে দিল। যে যে-ভাবে পারলো ছোটাছুটি করে কাদায় পা পিছলে মহা উৎসাহে মাছ ধরতে লাগলো, প্রায় দশ-বারো সের মাছ সংগ্রহ করে তবে ওরা ক্ষান্ত হল।

তারপর হাত পা ধুয়ে বনে ঢুকলো কাঠ কাটার জন্য। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল গেল ডান দিকে, আর অপর দলটি ঘুরে গেল বাঁ দিকে। মিনিট পাঁচেকও হয়নি, হঠাৎ ডান দিকের দলের একজন বললো, নারকেল দড়ির বাণ্ডিলটা ও দলে রয়ে গেছে। তখন ওরা থেমে 'কুই' দিল, সঙ্গে সঙ্গে অপর দলটির সাড়া পেয়ে এরা তাদের আসবার জন্য আর একটা সঙ্কেত পাঠিয়ে দিল। এরপর দলের নেতা মনোহর মণ্ডল একা চললো দড়ির বাণ্ডিলটা আনবার জন্য। দুটো দলই তখন যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অপেক্ষা তো আরও একজন করছিল! সেই তখন থেকে, যখন ওরা হৈ-হুল্লোড় করে মহানন্দে মাছ ধরছিল। তারপর ওদের দা-হাতে এগিয়ে আসতে দেখে অল্প একটু পিছিয়ে এসে গা আড়াল দিয়ে রয়েছে এই যা। যখন ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেল, তখন একটু অসুবিধা অবশ্য হয়েছিল বৈ-কি! কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! শিকার নির্বাচন করা যে তখনও হয়নি, কিন্তু নিয়তি ঠিক নির্বাচন করে রেখেছিল, তাই-তো দড়ির বাণ্ডিলটা ভুল দলে চলে গিয়েছিল।

মনোহর মণ্ডল আমার পুরনো মাঝি-বন্ধু। ওর নৌকোয় অনেক গাঙ পাড়ি দিয়েছি, লজেন্স খেতে খুব ভালবাসতো। হাল ধরে বলতো—ব্যানার্জীদা দাও একটা, বলে এমনভাবে হাত বাড়াতো, যেন কি মহা ঐশ্বর্য ওর হাতে এক্ষুণি এসে পড়বে। যেমন বুকের ছাতি, তেমনি সদাই খুশি, ব্যাজার কখন দেখিনি। তাই-তো দড়ির

বাণ্ডিলটা আনতে ভাল মানুষটাকেই যেতে হল! কাঁধে গামছা ও হাতে দা নিয়ে গুন্ গুন্ করে যাচ্ছিল, কতই বা দূর! হয়তো বিশ পাঁচশ হাতও নয়। বনের যেখানে এসে ওরা দু'ভাগ হয়েছিল, সেখানে আসতেই মনোহর মণ্ডলের হয়তো মনে হয়েছিল নৌকোটা একবার দেখে যাই। সেগুন কাঠের নৌকো, যেমন হাল্কা তেমনি দ্রুতগামী। এক লহমা বলতে কতটুকু সময় বোঝায়! হয়তো তারও আগে কি যেন ঘটে গেল সেখানে, দুটো দলের কেউ কিছুই জানালো না।

কোন শব্দ নেই। চীৎকার নেই, কান্নাকাটি নেই—শুধু একটা অস্পষ্ট হুটোপাটি, তারপর আবার সেই নির্জনের নিস্তব্ধতা। শুধু একটা দা মাটিতে অর্দ্ধ-প্রোথিত, একটা নিষ্ফল আঘাত মাটির বুকে নিঃশব্দে গেঁথে রয়েছে, আর লাল রঙের গামছাখানা লুটিয়ে রয়েছে কাদায়। আর সেই অঘটনের নীরব সাক্ষী এঁকে বেঁকে যাওয়া কতকগুলো কাদার চিহ্ন, আর তার উপর থাবার বিকৃত দাগ। দু' প্যাঁচ বা তিন প্যাঁচে জড়ান কণ্ঠীর তুলসী কাঠের মালাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, কতকগুলো দানা ছড়িয়েছিল, আর বাকিগুলো ছেঁড়া সুতোয় তখনও গাঁথা—তার উপর এক ফোঁটা তাজা রক্ত··· !

অনেক্ষক্ষণ হয়ে গেল, অথচ মনোহর মণ্ডলের দেখা নেই। ভয়ের কিছুই তখনও ওদের নজরে পড়েনি, তাই দুটো দলই পায়ে পায়ে ফিরে আসছিল। আর এমনি আশ্চর্য যে, দুটো দলই ঠিক একই সময়ে অকুস্থলে এসে পৌছল। সবিস্ময়ে দেখলো মনোহর মণ্ডল নেই, তার জায়গায় পড়ে আছে একখানা দা, লাল রংয়ের গামছা ও তুলসী কাঠের পবিত্র সেই ছেঁড়া মালাটা, যার শুচিতা হরণ করে টল্‌টল্ করছিল এক ফোঁটা লাল রক্ত। আর ভয়ানক সেই চিহ্ন! সে চিহ্ন দেখলে বুক শুকিয়ে যায়, মাথা ঝিন্‌ঝিন্ করে, মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। সেই চিহ্নের পাশে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে ওরা হাউ মাউ করে উঠলো, ভাঙ্গা স্বরে ডেকে উঠলো মনোহর মণ্ডলের নাম ধরে। তখন আতঙ্ক নেমে এল ষোলকলায় পায়ের সব শক্তি কেড়ে নিয়ে, সর্বাঙ্গ অবশ করে।

তারপর খালের চরে যথারীতি পুঁতে রাখা হল একটা নিশানা মনোহর মণ্ডলের গামছা বেঁধে। হাওয়ায় উড়তে লাগলো ওর জীবনের শেষ চিহ্ন! এরপর আমি যতবার ওই পথে পাড়ি দিয়েছি, বার বার নিজেকে কত কৃতজ্ঞ মনে হয়েছে। নিশানাটা দুলে দুলে যেন বলতো, ব্যানার্জীদা একটা লজেন্স দিয়ে যাও। বনের পারমিট যোগাড় করা নিয়ে নানা অসুবিধার দরুন দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে, মনোহর মণ্ডলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর তো শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তারপর অনেকদিন তো কেটে গেল, জানি না মনোহর মণ্ডল আজও আগেকার মত হাল ধরে আমার জন্য আর কোথাও অপেক্ষা করে আছে কি না! যখন লজেন্স চুষতে চুষতে হঠাৎ বাচ্চা ছেলেদের মত জিভের 'টক্' করে একটা আওয়াজ করতো, তখন মনোহর শিশু হয়ে যেত। মুখে যে হাসি ফুটে উঠতো তা ভোরের আলোয় ফোটা ফুলের মতই নিষ্পাপ!

খালের নাম ফুলবাড়ী। কেউ ওপথ মাড়াতে চায় না, মাঝিরা বলে, যমের দক্ষিণ দোর! তবু গোপা-দ্বীপে এলে ফুলবাড়ী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। এক এক দ্বীপের এক এক রকম চেহারা, সৌন্দর্য! দু'চোখ ভরে দেখেও যেন আশ মেটে না। গোল-দ্বীপ কিন্তু জেলেদের মস্ত ঘাঁটি, তবু ফুলবাড়ীর খাল যেন এক বিভীষিকা!

সেবার খালের এপারের বনে কাঠ কাটার কূপ হয়েছিল। আমি যখন এসে পৌঁছলাম তখন কূপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় নৌকোগুলো কাঠ বোঝাই হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। জেলেদের ঘাঁটির অল্প দূরে বনবিবির মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি এক জায়গায় নৌকো ভেড়ালাম। জেলেরা জানালো, কয়েকদিন আগে ওদের দল থেকে একজনকে বাঘিনী নিয়ে গেছে। এই বাঘিনীই না-কি এ অঞ্চলের বিভীষিকা। খবরে জানা গেল—বাঘিনীটা না-কি বুড়ী, আর ওর গলায় দড়ির একটা ফাঁস আছে, বাঘিনীর গলায় ফাঁস! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা'হলে ফাঁসের গল্পটা শুনুন—

যখন কূপের কাজ চলছিল, কাঠুরেরা একদিন ঠিক করলো হরিণ

ধরবে। ওদের তো বন্দুক নেই, তাই ফাঁস পেতে হরিণ ধরে খাবে। বনের মধ্যে মিষ্টি জলের দুটো কূপ ছিল, ওরা লক্ষ্য করেছে রাত্রে হরিণ এসে সেখানে জল খায়। একদিন দড়ির ফাঁস পেতে রাখলো সন্ধ্যাবেলা, আর কান খাড়া করে রাখলো ফাঁসে ধরা হরিণের আর্ত চীৎকার কতক্ষণে শুনতে পাবে। রাত যখন প্রায় দশটা, হঠাৎ বাঘের গর্জন ভেসে এল, তার আঁউ-আঁউ শব্দ ও ছুটোপাটি শুনে ওরা বুঝতে পারলো হরিণের পরিবর্তে বে-আক্কেলে বাঘ সেই ফাঁস পরে বসে আছে! তারপর সকাল হতেই ওরা ভয়ে ভয়ে দেখতে গেল ফাঁস পরে বড় মিঞা কি করছে। গিয়ে দেখে ফাঁস ছিঁড়ে বাঘ পালিয়ে গেছে। তারপরেই সেই আক্রোশে জেলেদের একজন ওর কবলে পড়লো, তখনই দেখা গিয়েছিল ওটা বড় মিঞা নয়, সেই হোঁৎকা বুড়ি বাঘিনী, দড়ির ফাঁসটা তখনও তার গলায় ঝুলছে।

ওরা মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল সেই খালেরই ধারে, বাঘিনী মড়ি মুখে নিয়ে খাল পার হতে পারেনি। আধ খাওয়া দেহ কোন গতিকে সৎকার করে বনবিবির পূজো দিয়েছিল খুব ঘটা করে, সেই থেকে বাঘিনীর খবর আর কেউ জানে না। আমি প্রায় সাতদিন এক-নাগাড়ে চেষ্টা করেও বাঘিনীর দেখা পেলুম না। এমন কি কয়েকটা নিঃসঙ্গ রাত গাছের ডালে কাটিয়েও তার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। শুধু এক রাত্রে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগলো। ভালভাবে লক্ষ্য করে মনে হল কি যেন একটা দেখতে পাচ্ছি, বনের মধ্যে নড়া-চড়া করছে। লক্ষ্য স্থির রেখে অত দূর থেকেই দো-নলা ৪৫০/৪০০ রাইফেলটার ঘোড়া টিপে দিলাম। প্রচণ্ড আওয়াজের শেষে দেখলাম —কি একটা জানোয়ার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, তারপর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে গেল। তারপর সারা রাত কেটে গেল, আর কিছুই ঘটলো না।

দিনের পর দিন জল-কাদা ঘাঁটা আর হাঁটাহাঁটির পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে কখন চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে এসেছিল জানি না, হঠাৎ কে যেন ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

তাড়াতাড়ি রাইফেল তুলে নিয়েই দেখি—সেই আলো-আঁধারিতে কি একটা জন্তু ঝোপের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জন্তুটার খুব সামান্যই দেখা যাচ্ছিল, পিঠের গড়ন দেখে মনে হল বাঘ। ফুলবাড়ীর হোঁক্কা-বুড়ীর (হোঁৎকা-বুড়ীর) জন্য তখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কিছুতেই বাঘিনীকে গুলির আওতায় আনতে পারছিলাম না। ঝোপের মধ্যে জন্তুটার ওই সামান্য অংশ দেখেই তখন মনে হয়েছিল ফুলবাড়ীর বাঘিনীকে পেয়েছি। পিঠের শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিলাম। জন্তুটা কোন শব্দ না করে সেখানেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেল ও কয়েকবার পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। ওর মৃত্যু দেখেই আমি দমে গেলাম। রোদ উঠতে নীচে নেমে দেখি যা অনুমান করেছিলাম —তাই, একটা হরিণ। বনের অপ্সরী কাজল-টানা চোখে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে! তারপর বনের মধ্যে প্রবেশ করে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম মাঝ-রাতে যাকে গুলি করেছিলাম সেও ফুলবাড়ীর হোঁক্কা-বুড়ী (বাঘিনী) নয়, মাঝ-বয়সী একটা পুরুষ বাঘ। কোথাও রক্তের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না, গুলি খেয়ে বাঘটা লাফিয়ে উঠে একটা হাঁকোড় না দিলে ধরে নিতে বাধ্য হতুম, গুলিটা ফসকে গেছে!

অযথা হরিণটাকে মেরে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি, মণ্টু ও আমাদের গাইড সাকার আলীকে সঙ্গে নিয়ে আবার বনে নামলাম। অনেকটা যাওয়ার পর ঘন ঘাসবনের ধারে পৌঁছে দেখি মস্ত এক টিকের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে, সাকার আলী বললো, জোয়ারে ভেসে এসেছে। জলোচ্ছ্বাস কত প্রবল হলে এত ভারী গুঁড়িটা এত দূর আসতে পারে ভেবে অবাক হলাম। যাই হোক, ঘাসবনের অনতিদূরেই দেখলাম মিষ্টি জলের দুটো কূপ রয়েছে, হোঁক্কা-বুড়ী এই কূপেই জল খেতে এসে গলায় দড়ির ফাঁস পরেছিল। জায়গাটা খুব পছন্দ হল, মণ্টুর সঙ্গে পরামর্শ হল এখানেই কোথাও বসে বাঘিনীর জন্য অপেক্ষা করবো। জলের কূপ থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে পাশাপাশি দুটো ছোট ছোট গাছ

ছিল, আমরা সেই গাছ দুটোয় চড়ে বসলাম। একটায় আমি, পরেরটায় মণ্টু এবং সাকার আলী।

বিকাল চারটে বেজে গেল তখনও পর্যন্ত কিছু ঘটেনি, কিছুক্ষণ পরেই এক ঝাঁক হরিণ সেই ঘাসবনে চ'রতে এল, তার মধ্যে দুটোর শিং অপূর্ব, প্রায় রেকর্ড-সাইজ হবে। হরিণদের শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, হঠাৎ দেখলুম হরিণরা বনের একদিকে মুখ তুলে ঘন-ঘন কান নাড়ছে। শরীরের আর কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই, ঠিক ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে মনে হল নিশ্চয়ই কোন বাঘ বা মানুষ কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছে। এমন সময় সমস্ত বন সচকিত করে বাঘের ডাক ভেসে এল, আঁউন্। মুহূর্তে সব ফাঁক হয়ে গেল, ঘন বনের মধ্যে ভয়ার্ত হরিণদের চিৎকার ভেসে এল, বানরেরা কিচমিচ করে গাছের ডাল ঝাঁকাতে লাগলো। এক পাল শুয়োর কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের গাছগুলো ঘুরে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে পরিবেশ বদলে গেল, সমস্ত বনটাই যেন সেই আঁউন্ শব্দ শুনে চমকে-চমকে শিউরে উঠতে লাগলো। তখনও বাঘ ফাঁকায় আসেনি, ঘন বনের মধ্যে কোথায় যে রয়েছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

সেই হট্টগোলের ফাঁকে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি, সঙ্গে কোন আলোও ছিল না। রাইফেল হাতে তখনও বনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি, বন তখন নীরব নিস্তব্ধ। বাঘিনীর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমরা ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এক-পা এক-পা করে নৌকোয় ফিরে এলুম। সারারাত শুধু নদীর শব্দ হতে লাগলো। আর কোন শব্দ নেই, এমন কি হরিণরাও আর ডাকলো না। সেই নৈশ অন্ধকার মাড়িয়ে ফুলবাড়ীর বাঘিনী তখন খালের ওপারে না এপারে কেউ জানে না। পরের দিন আবার সেখানে পৌঁছে গাছে উঠতে গিয়েই চমকে উঠলাম। মণ্টুর গাছের গায়ে প্রায় পাঁচ-ফুট ওপরে কতকগুলো সদ্য টানা-টানা দাগ, আর আমার গাছটার প্রায় ছ-ফুটের কাছাকাছি সেই একই টানাটানা আঁচড়ের দাগ। বাঘ

গাছের গায়ে দাঁড়িয়ে উঠে এইভাবে নখ পরিষ্কার করে, আঁচড়গুলো ধারালো নখের দাগ। গত দিন সন্ধ্যার পর ফিরে গিয়ে মস্ত একটা সুযোগ নষ্ট করেছি, কিন্তু এ-রাতে আমরা টর্চ নিয়ে এসেছি। সুতরাং সারারাত গাছের ডালে থাকতে কোন অসুবিধে নেই।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু গতকালের মত হরিণরা চরতে এল না। গতকাল এই ঘাসবন ছবির মত ফুটে উঠেছিল, আজ আর তার সেরূপ নেই—ফাঁকা। বাতাসের বেগে স্থির তরঙ্গের মত ঢেউ খেলানো। অনেক দূরে কোথাও সলুই ডাকছে। আকাশভরা তারার আলো, কিন্তু নীচে ঘোর অন্ধকারের বুকে স্তব্ধ অরণ্য—কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। একজোড়া 'ওয়াক্-পাখী' ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। বনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি, ক্রমে সেই অন্ধকার চোখে স'য়ে এসেছে—তবু কোথাও কোন নড়া-চড়া চোখে পড়লো না। হরিণের ঝাঁক কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কে জানে! এমন সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে কি একটা জন্তু বেরিয়ে এল, রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে অপেক্ষা করছি। জন্তুটা কি তখনও বুঝতে পারিনি, কিন্তু আশা করছি সে ফাঁকায় বেরিয়ে আসবে। কিন্তু জন্তুটা আমার ইচ্ছামত ফাঁকায় না এসে সেখানেই ঘুরপাক্ খেতে লাগলো।

প্রথমে ভাবলুম হয়তো হরিণ, পাতা খাচ্ছে। কিন্তু বাঘ পাতা না খেলেও এ-ভাবে কি পাক্ খেতে পারে না! যদি বাঘই হয় তাহলে সেই গুলি-খাওয়া পুরুষ বাঘটা, না-বাঘিনী! মনের মধ্যে কেমন সন্দেহ হল এবং ধারণা হল জন্তুটা ফাঁকায় না এসে বোধহয় জঙ্গলেই আবার ফিরে যাবে। যাই হোক, গাছের ডালে রাইফেলের নল রেখে টর্চের বোতামে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুল রেখে এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলুম যদি বাঘ হয় গুলি করবো। দূরত্ব যদিও পঞ্চাশ ষাট গজের বেশী হবে না, কিন্তু আমাকে আর একবার চেষ্টা করতেই হবে। কারণ এ রাতটাই আমার ফুলবাড়ীর শেষ রাত। আমার কাছে যে পারমিট ছিল তার মেয়াদ মাত্র দশদিন। আটদিনের মাঝরাতে আমি পুরুষ

বাঘটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করবার সুযোগ পেয়েছি মাত্র। এ কয়দিনের প্রচেষ্টায় ফুলবাড়ীর বাঘিনীর গায়ে একটা আঁচড় কাটতেও পারিনি।

যে রাতে পুরুষ বাঘটাকে গুলি করেছিলুম, সেই রাতেরই শেষ-লগ্নে আচম্কা ঘুম থেকে উঠে আলো-আঁধারীর ভুলে বনের অপ্সরীকে নিহত করেছি। আর এখন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা জন্তুটাকে হরিণ ভেবে যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি এবং ভোরবেলায় সেখানে গিয়ে যদি বাঘিনীর থাবা চোখে পড়ে, তাহলে এ ভুলের কোন ক্ষমা থাকবে না। সুতরাং শেষ মুহূর্তে আর কোন ভুল নয়, আমাকে নিঃসন্দেহ হতেই হবে। ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে টর্চের বোতাম টিপলাম। অন্ধকার ভেদ করে এক ঝলক তীব্র আলো যার মুখে পড়লো, সে বেচারী মোটেই তৈরী ছিল না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ তুলে ঘুরে দাঁড়াল, হয়তো এমন আলো আর কখনো দেখেনি—কেমন বিহ্বল হয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখখানি নামিয়ে অন্ধের মত ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে গেল।

আমার ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে আর একবার হাসলো। রাইফেলটা নামিয়ে রাখতে রাখতে দেখলুম শুয়োরটা তখনও হাতড়াতে-হাতড়াতে চলেছে। গত রাত্রে এই দুটো গাছেই বাঘ ও বাঘিনী এসে আঁচড়ে গেছে, আমরা টর্চ আনিনি বলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম। এ ভুল এত পরিষ্কার আর এমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আমার আর কোথাও হাতড়াবার অবকাশ রইলো না। ভাগ্য তখনই মুখ ফিরিয়ে হেসে নিয়েছিল, এখন আর একবার হাসলো।

পূব-আকাশে আলোর আভা ফুটে উঠলো, আমাদের শেষ রাত ফুরিয়ে যেতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকী। এখন বনের প্রাণীরা সকলেই যে-যার ডেরায় ফিরছে, গাছের গায়ে নখ আঁচড়াতে এখন কেউ আসবে না। এমন সময় তীব্র স্বরে হরিণ ডেকে উঠলো, টাউ-টাউ করে সমস্ত বন সঙ্কেত-ধ্বনিতে ভরিয়ে তুললো। শেষ মুহূর্তে রাইফেলটাকে যখন আর একবার বাগিয়ে ধরছি তখনই খালের জলে ভারী জিনিষ

পড়ার শব্দ হল, তারপরেই দেখলুম হরিণটা বনের ধার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে গুটি-গুটি করে চলেছে। এতক্ষণ পরে সাকার আলী কথা বললো, বাঘিনী ওপারে চলে গেল। আমিও তাই বুঝলুম, কিন্তু সারারাত সে এপারের বনে কোথায় ছিল যে, বনের হরিণরা পর্যন্ত টের পায়নি!

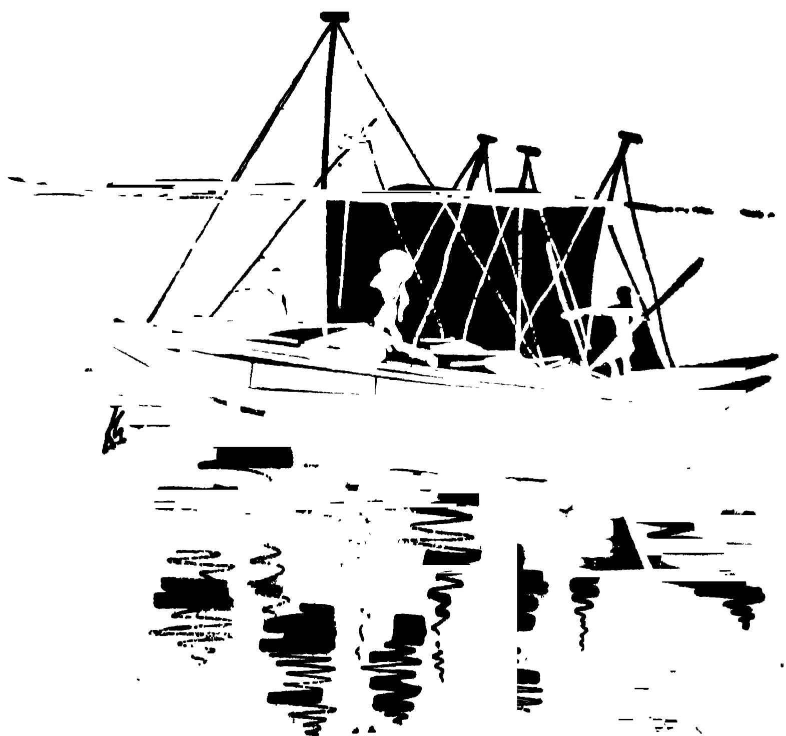
সারাদিন বিশ্রাম নেবার পর বিকালে নৌকোর নোঙ্গর তোলা হল, মাঝিরা দাঁড়ে বসলো। ফুলবাড়ীর বনে তখন উত্তরের বাতাস বইছে। গভীর জলে সার-বন্দী জেলে-নৌকের ছায়া কাঁপছে। ফুলবাড়ীর আতঙ্ক (হোঁকা-বুড়ী) বুড়ী বাঘিনী খাল পেরিয়ে ওপারের সেই তরুণ বাঘের ঠিকানায় চলে গেছে। পালে বাতাস লাগতেই রাজ-হংসীর মত দুলে উঠলো নৌকো, ফুলবাড়ীর খাল মিলিয়ে যেতে লাগলো। তখন সেখানে আরও একটা অপরূপ সন্ধ্যা নেমে আসছে। ক্রমে সেই সন্ধ্যা রাত হবে, তখন সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে ফুলবাড়ীর খাল-পারের নিভৃত বন থেকে ভেসে আসবে পূর্বরাগের মৃদু তর্জন-গর্জন। সেই সুরেলা ডাক শুনে রাত-কানা বানরের দল গাছের ডাল ধরে সকৌতুকে মাথা নাড়বে, খালের ধারে মাছ-ধরা সলুই চমকে চমকে ডানা মেলবে আর বিস্ফারিত কাজল-কালো চোখ মেলে ভীরু হরিণের দল বন-বাদাড় ভেঙ্গে নিঃশব্দে ছুটবে। অরণ্য-বাসর তখন জম-জমাট···।

মরানির ঢেউ ফিস্‌ফিসিয়ে উঠবে নির্জন নদী-তীরে। বনের কীট-পতঙ্গেরা এতক্ষণ গলা ফুলিয়ে যে মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করছিল, এবার তার সমাপ্তি ঘটবে। মুগ্ধ সঙ্গিনীদের হাত ধরাধরি করে চলা শুরু করবে বনের নিরালা কোণে মনের মাধুরী উজাড় করে দিতে। পাখীর উচ্ছিষ্ট বা বিষ্ঠা থেকে যে বীজ মাটির গর্ভে এতদিন তিল-তিল করে পুষ্টিলাভ করছিল, ধীরে ধীরে বিস্তার করবে অঙ্কুর। রহস্যময়ী প্রকৃতি লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে নিভৃতে তন্ময় হয়ে ওঠে সৃষ্টির বিচিত্র খেলায়। তখন চঞ্চল পাতায় পাতায় ইসারা হয়, মুগ্ধ বাতাস কেঁপে কেঁপে ফুলের কুঁড়ির ঘুম ভাঙ্গায়। সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা প্রকৃতি

ফুলে-ফলে সাজে, পাখীর কল-কণ্ঠে গান হয়ে সুরের লহরী ছড়ায়, আর সেই সুরে নদী বয় তরঙ্গে-তরঙ্গে কত রঙ্গে দু-কূলের তৃষ্ণা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

এ-হেন সুন্দরবন ছেড়ে যেতে মন চায় না। মনে হবে কি যেন র'য়ে গেল, কি যেন ফেলে এলেন সেখানে! অপলক দৃষ্টি যখন ক্লান্তিতে ফুরিয়ে যাবে তার দুরন্ত সীমানা খুঁজতে, তখন দূরে, দূর দিগন্তে পেন্সিলের রেখার মত আঁকা রয়েছে অপরূপ সুন্দরবন!

ঘর-মুখো মাঝিরা তখন কি বিপুল উৎসাহে দুলে-দুলে দাঁড় বাইবে—হেঁইও মাঝি—হেঁইও, সাবাস্ মাঝি—হেঁইও, সামাল মাঝি—হেঁইও, জোর্‌সে মাঝি—হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও···!



সুন্দরবনের বাঘ যে কত দুঃসাহসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সময় সময় বাঘ দুঃসাহসের সীমা কতটা যে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কল্পনাও করা কঠিন।

দুঃসাহস কথাটা আজকাল এমন সহজভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে যে, শব্দটার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝানোর যখন প্রয়োজন দেখা দেয়—তখন এতে আর কুলোয় না। অর্থাৎ শব্দটার গুরুত্ব ঠিক তেমন করে কানে আর যেন বাজে না। তখন মনে হয়, আরও কিছু বিশেষণ যোগ করতে না পারলে কথাটার তাৎপর্য হয়তো মনের মত করে বোঝান গেল না।

পাড়ার অমুকের মত দুঃসাহসী ছেলে আর দেখিনি, কিম্বা অমুকের কীর্তি শুনেছ? বুকের পাটা আছে বটে, দুঃসাহসী আর কাকে বলে···! চায়ের দোকানে, পাড়ার রকে আর ট্রামে-বাসে কথাটা এত হাল্কা হয়ে গেছে যে, শুনে শুনে মনে হয় আটপৌরে কথাটার প্রকৃত আর কোন মূল্য নেই।

বাঘ তো চিরকালই সাহসী, শিকার করে তাকে খেতে হয়—প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করে তাকে বাঁচতে হয়। কিন্তু মানুষখেকো বাঘ—যার প্রতিটি পদক্ষেপ হিসাবের অঙ্কে বাঁধা, মানুষের বোধ-শক্তির সঙ্গে যাকে সমানে পাল্লা দিতে হয়, ধূর্তমীর খেলায় যাকে বুদ্ধিমান মানুষকেই পরাস্ত করতে হয়, মুহূর্তের অবহেলায় একটা নিক্ষিপ্ত সীসের গুলিতে তার মৃত্যু অবধারিত।

নরখাদক উপদ্রুত সুন্দরবনের কর্দমাক্ত গুলোয় ভরা ঘন অরণ্যময় দুর্ভেদ্য দ্বীপগুলোতে যে সব কাঠুরে-নৌকো, জেলে-নৌকো ও মৌলীদের নৌকো এসে নোঙর ফেলে, তাদের কাছে নরখাদকদের 'দুঃসাহস' কথাটার আসল তাৎপর্য কি বিভীষিকাময় হয়ে ছড়িয়ে আছে দীর্ঘকাল ধরে—এখানে তার সামান্য কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দীর্ঘ জলযাত্রার শেষে নৌকো ও বজরাগুলো যখন বনের সংকীর্ণ খালের ধারে নোঙর ফেলতো, তখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মাঝি-মাল্লারা আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসে তামাক খেতে খেতে দেখতো দু'পাশের নিবিড় বন-জঙ্গল। মনুষ্য বসতি-হীন বন্য বাদা অঞ্চল যেন ওৎ পেতে রয়েছে সৌন্দর্যের আচ্ছাদনে মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে। খালের ঘোলা জলে যখন গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হয় তখন [illegible] আলো

ফুরিয়ে আসে ধীরে ধীরে, তখন দিগন্ত-বিস্তৃত নদীর বুকে সিন্দুর গুলে দেয় অস্তগামী সূর্য আর দিনের শব্দের শেষ সুর তুলে নেয় রাতের পোকা-মাকড়রা। তখন তারার আলোয় চিক্‌চিক্ করে ওঠে কর্দমাক্ত তীর, একাকার হয়ে যায় অসংখ্য পদ-চিহ্ন, যা দিনের আলোয় ভীতির সঞ্চার করে।

এইভাবে মরশুমের প্রথম দিকে ওদের নূতন করে আবার পরিচয় হতো নোনা বাদার সঙ্গে, তারপর শুরু হতো এক নূতন অধ্যায়! সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয় বনে, ঠক্‌ঠক্ শব্দে মুখর হয়ে ওঠে নীরব বন। মানুষগুলোও আবার আশঙ্কা আর অস্বস্তি কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠবার চেষ্টা করতো, কথাবার্তা বলতো প্রাণ খুলে—আর তার ফাঁকে ফাঁকে চলতো হাসি মস্করা, ঠাট্টা তামাসা। এইভাবে ওরা জোর করে বনের আবহাওয়া সহজ করে তুলতো, শ্রমের একঘেঁয়েমী নষ্ট করে কাজের উদ্যম সঞ্চয় করতো। কখন কখন খিস্তীর তুফান তুলতো ওদের অপ্রিয় ব্যক্তিদের কটাক্ষ করে। পাহারা দেওয়ার জন্য যাদের গাছের ডালে তুলে দেওয়া হতো, কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হতো তাদের পাতার আড়ালে বসে। ইন্দ্রের মত সহস্র-লোচনে বনের অলি গলি তন্ন তন্ন করে খুঁড়ে বেড়াতো দিন-ভোর, যতক্ষণ না কাজ শেষ হতো।

সকালে যখন দেখা যেত খালের চরে বাঘ হেঁটেছে, তখন কর্তব্য-কর্মে আর এতটুকু ঢিলে-ঢালা ভাব থাকতো না, পাহারাও হতো জোরদার। তখন হাসি-ঠাট্টার স্থান দখল করে থাকতো আতঙ্ক। প্রাণ হাতে নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো কতক্ষণে মহাজনের কাজ শেষ হবে। কিন্তু সুন্দরবনের নরখাদক যতই দুঃসাহসী হোক না কেন, তার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তখন আবার কাজ অসমাপ্ত রেখেই তুলতে হতো নোঙর, পড়ে থাকতো স্তূপাকার করা কাটা গাছ। খালের চরে দ্রুত একটা ছেঁড়া কাপড়ের নিশানা টাঙিয়ে দিশেহারার মত দাঁড় বাইতে হতো।

এত পাহারা, এত লোকজনের সরব কথাবার্তা, ধারালো

দা-কুঠারের শব্দের মধ্যেও বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো বাঘ! চাপা-পড়া মানুষটার বুকের উপর একটা থাবা তুলে দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জনে অবশ-পঙ্গু করে দিত হতভম্ব মানুষগুলোকে। সেই ফাঁকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে নিত ওদের মতলব। দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত শিকার মুখে নিয়ে বনের গভীরে।

সুন্দরবনের বাঘ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানে বাদার মানুষের কাজ-কর্মের নিখুঁত খবরাখবর। কোথায়, কখন এবং কি ভাবে মানুষ তার খপ্পরে এসে পড়বে, এ-খবর তার নখদর্পণে। টানা জালের বেড় দিয়ে কখন জেলেরা কোথায় এবং কোন্ গাছে দড়ি বাঁধবে বা কখন নোঙর তুলতে তীরে নামবে নরখাদকদের তা জানা আছে।

নিরীহ হরিণও মরবার সময় দুটো চাঁট্ মারে, কিন্তু মানুষের মত এমন সহজ শিকার বুঝি আর নেই। দর্শন মাত্রই মূর্ছা ও পতন, শুধু তুলে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা, তবু মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

ভারাবুনি হয়ে বাটিহারার পথে যেতে যেতে বাঁ-দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে যে নিস্তরঙ্গ জলরাশি চোখে পড়বে, যার চতুর্দিকেই শুধু বন আর বন। সেই জলাশয়ের পশ্চিম তীরে একখানি মৌলিদের নৌকো বাঁধা ছিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর, মৌলীরা বনে গেছে মধু কাটতে—তখনও ফেরেনি। মাত্র দু'জন মাঝি নৌকো পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় একটা বাঘ বন থেকে উঁকি মেরে দেখছিল ওদের, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ক্ষুধার্ত বাঘটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বন থেকে। তারপর কাদার উপর দিয়ে এগিয়ে চললো নিঃশব্দে নৌকোর দিকে। মাঝি দু'জন রান্নার কাজে সেই সময় ব্যস্ত থাকায় বাঘটাকে দেখতে পায়নি। বাঘটা যখন নৌকোর কাছাকাছি পেঁাছে গেছে, সেই সময় ওদের নজর তার উপর গিয়ে পড়লো। লোক দু'টি মহা আতঙ্কে সব কাজ ফেলে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল বৈঠা তুলে নিয়ে, তারপর শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলো—যাতে বাঘটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

ক্ষুধার্ত বাঘটা পালিয়ে যাওয়ার জন্য তো আসেনি। যেই থাবা বাড়ালো নৌকোয় উঠবে বলে, অমনি লোক ছু'জন নৌকোর অপর মাথা থেকে সর্ব-শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিল হাতের বৈঠা দু'খানা বাঘটাকে লক্ষ্য করে। বৈঠা দু'খানার মধ্যে একটা এসে পড়লো তার থাবার সামনে, আর অপরটা মাথায়। বাঘটা রেগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকোয় উঠতেই, সেই দোলা লেগে নোঙর আল্‌গা হয়ে নৌকোও সমান বেগে এগিয়ে চললো গভীর জলের দিকে। লোক দু'টির পালাবার আর কোন পথ না থাকায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং প্রাণপণে সাঁতার কেটে অপর তীরে চললো, বাঘটাও জলে ঝাঁপিয়ে ওদের পিছন পিছন আসছিল কি না দেখবার অবকাশ ছিল না। প্রাণের তাগিদ এমনই যে, প্রথম লোকটি কোন গতিকে তীরে পৌঁছেই সামনের বড় গাছটায় পড়ি কি মরি করে উঠে পড়লো। তারপর শীর্ষ-ডালে পৌঁছে নিজেকে গামছা দিয়ে বেঁধে তবে সঙ্গীর সন্ধানে এতক্ষণে নীচের দিকে তাকাল।

সঙ্গী নেই! বনের কোন দিকেই সে ওঠেনি, অথচ একই সঙ্গে তারা জলে ঝাঁপিয়েছিল। সঙ্গী হয়তো নৌকোতেই আবার ফিরে গেছে ভেবে সেইদিকে নজর ফেরাতেই দেখতে পেলো বাঘ নৌকোর গলুই-তে তখনও বসে আছে। আর নৌকোটা মাঝ দরিয়ায় গোল হয়ে ঘুরছে। লোকটা আতঙ্কে বোবা হয়ে গেল এবং কতক্ষণ সেইভাবে ছিল তা ওর অজানা। মৌলিরা মধু কেটে ফিরে এসে দেখলো নৌকো মাঝ দরিয়ায় ভাসছে এবং তার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে চিৎকার করে ওদের ডাকলো—কোন সাড়া নেই। মৌলিরা ঘুমিয়ে পড়েছে, আর গেরাপি খুলে নৌকো মাঝ দরিয়ায় ভেসে গেছে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেও যখন কোন জবাব পাওয়া গেল না, তখন মৌলিরা চিন্তায় পড়ে গেল কেমন করে নৌকো তীরে ঠেলে আনবে। কুমীর কামটের ভয়ে জলে নামতেও কারো সাহসে কুলোচ্ছিল না। এই জলাশয়েই ওরা একদিন মেটে রঙের একটা বড় কুমীর দেখেছিল। ক্লান্ত মৌলিরা তীরে বসে মাঝি দু'জনের ঘুম ভাঙ্গার আশায় এন্তার খিস্তী আওড়াতে লাগলো।

এমন সময় আর একখানা নৌকো সেই জলাশয়ে এসে হাজির হলো। এরাও মৌলি। এতগুলো মানুষকে তীরে বসে থাকতে দেখে দাঁড় বেয়ে দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কিছু ঘটেছে কি না। তখন বিরক্ত মৌলিরা জানাল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা, তখনও খাওয়া হয়নি। নবাগত নৌকোখানা তখন মাঝ-দরিয়ায় এগিয়ে গেল নৌকোটাকে তীরে টেনে আনবার জন্য। ঘুমন্ত মাঝির পরিবর্তে একটা বাঘ তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য সেখানে যে অপেক্ষা করে রয়েছে—সে কথা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। 'কুম্ভকর্ণকেও যে হার মানালে গো', বলে যেই নৌকোর গায়ে নৌকো ভিড়িয়েছে। অমনি বাঘটা গাঁক্ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের মানুষটার ঘাড়ে। হুড়োহুড়ি, তাল-গোলের মধ্যে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়লো তার ঠিক নেই। চেঁচামেচি, কান্নাকাটির মধ্যে ভারাবুনির নির্জন বন মুহূর্তে সরগম হয়ে উঠলো। দুটো নৌকোই তখন আবার বিছিন্ন হয়ে গেছে, সেই ফাঁকে দেখা গেল বাঘটা একটা মানুষকে কামড়ে ধরে তীরের দিকে সাঁতার দিয়ে চলেছে।

দুটো নৌকোই এরপর তীরে ফিরে এল। হৈ-হট্টোগোল এক সময় থাকতে দেখা গেল প্রথম নৌকোর কোন মাঝি নেই। দু'জনে ছিল, দু'জনেই উধাও! বাঘটা যে ওদের খেয়েছে তার কোন চিহ্ন নৌকোতে নেই, বৈঠা দু'টো তখনও জলে ভাসছিল। দ্বিতীয় নৌকো থেকে বাঘ মানুষ নিয়েছে সেই আতঙ্কে ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না। এদিকে প্রথম নৌকোর মৌলিরা ভেবে পেল না মাঝিরা গেল কোথায়! এমন সময় অনেকদূর থেকে অস্পষ্ট মনুষ্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মৌলিরা চিৎকার করে সাড়া দিতে দিতে দেখলো ওপারের একটা গাছের ডাল-পালা নড়ছে, আর ক্ষীণ চিৎকারটাও যেন সেইদিক থেকেই আসছে। তখন নৌকো বেয়ে ওপারে যেতেই আতঙ্কগ্রস্ত লোকটি গাছ থেকে টল্‌তে টল্‌তে নেমে এল। ওর সঙ্গী যে কিভাবে উধাও হয়ে গেল তার কোন খবরই সে দিতে পারলো না। জল থেকে সে যে ওঠেনি শুধু সেই কথাই বলতে লাগলো বার বার।

সকলে ভেবে নিল তাকে কুমীরে নিয়েছে। সুতরাং একজন গেল কুমীরের পেটে, আর একজন গেল বাঘের পেটে। বাঘটার দুঃসাহসের জন্যই তো এত কাণ্ড ঘটলো…! এইভাবে মরশুমের পাঁচ-ছ'টা মাস কাটুরে, জেলে ও মৌলীদের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে খালের প্রত্যেকটি চরে উড়িয়ে দিয়েছে তার দুঃসাহসের উদ্ধ নির্মম নিশানা।

একবার একটা বাঘ কালিতার-চর থেকে নদী সাঁতরে চর-ঘেরির লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। চর-ঘেরির এলাকা সজনেখালি ফরেস্ট স্টেশনের ঠিক দক্ষিণে। এ অঞ্চলকে সায়েবের লাট অর্থাৎ হ্যামিলটন সাহেবের লাট বলা হতো। এর পশ্চিমে উত্তর গাও। দত্তর ফরেস্ট অফিসারের ঠিক বিপরীত দিকে এই চর-ঘেরি। এদিকে কালে-ভদ্রে বাঘ এসে পড়ে। এই বাঘটা কি খেয়ালে নদী সাঁতরে হঠাৎ এসে পড়লো। চর-ঘেরির এলাকায় প্রবেশ করেই প্রথমে একটা গরু মারলো। বিধাতার নির্দেশে মাংসই তার একমাত্র খাদ্য, অতএব গরু মারাটা সে একটা সাধারণ নিত্য-কর্ম ভেবেছিল। কিন্তু মানুষের বিধানে যে সেটা ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ, গেরস্তর দুধলো গরু আর জরু বড় আদরের জিনিস। অতএব মার শালার গো-খেকো বাঘকে—বলে গ্রাম শুদ্ধু সবাই লাঠি-সোঁটা নিয়ে রৈ রৈ করে বন ঘিরে ফেললো।

ঋষিবর পাইক বড় চাষী, ধানের গোলা পাহারা দেবার জন্য ঘরে দো-নলা বন্দুক রয়েছে। সেই বন্দুক পেড়ে তেল টেল দিয়ে পুঁছে ডিঙ্গিতে চেপে বসলো—চল্ উত্তরা। বনের তিন দিক পূর্বেই ঘিরে ফেলা হয়েছিল, বাকী ছিল দক্ষিণ দিকটা। সেই দক্ষিণের খালে উত্তরা ডিঙ্গি বাইতে লাগলো। এই উত্তরা অনেক পুরনো আর বিশ্বাসী লোক। জমি জিরেৎ সবই তাকে দেখাশোনা করতে হয়। গত সনে কাঠ কাঠতে গিয়ে উত্তরার এক ভাইকে বাঘে নিয়ে যায়, উত্তরাও সেই দলে ছিল কিন্তু ভাইকে বাঁচাতে পারেনি। দক্ষিণের খালে দাঁড় বাইতে-বাইতে সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ দাঁড় তুলে থামিয়ে দিল নৌকো, তারপর পাইক মশাইয়ের কানের গোড়ায় মুখ এনে

ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, বাঘ! পাইক মশাই টাল সামলাতে সামলাতে তো-তো করে উঠলেন, কি বললি,—বাঘ? কোথায়? ওই তো, বলে উত্তরা আঙ্‌ল বাড়িয়ে বাঘ দেখিয়ে দিল।

পাইক মশাই দেখলেন—হ্যাঁ, বাঘই বটে। যে-সে নয়, খাস্ সোঁদর বনের ডোরা কাটা সেই বাঘ, ইয়া মস্ত গোঁফ, যাকে বলে সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'! উত্তেজনাবশে বন্দুক বাগিয়ে ধরতেই দাঁত কড়-মড় করে উঠলো, নিয়ম মাফিক লম্বা দম্ নিয়েই হিস্-হিস্ করে বললেন, পেছনে বসা উত্তরাকে, জাপ্‌টে ধর্। উত্তরা পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরলো প্রাণপণে, তারপর বললো, মারো।

গ্রামের লোকেরা তখন বনের তিন দিকে ঘিরে সমানে তর্জন গর্জন করে চলেছে। গ্রামের আর এক মাতব্বর সুরেনবাবু বনের উত্তর দিকে গিয়ে দুম দুম করে বন্দুক ছুঁড়তে লাগলেন। বাঘটার তখন আর পালাবার পথ ছিল না। ইঁট পাটকেল, লাঠি সোঁটা, তীর বল্লম চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছিল। বাকী ছিল খালের দিকটা, এমন সময় পাইক মশাই বন্দুক উঁচিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে এলেন। বাঘ দেখেই হাঁক দিলেন জাপ্‌টে ধর। পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরেই উত্তরা বলে উঠলো, মারো দিকিন্। অমনি দুম্ করে ফায়ার হয়ে গেল। হঠাৎ পিছন থেকে মার খেয়েই বাঘটা গাঁক করে শূন্যে লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে ছুটলো। সেখানে একদল লেঠেল ছিল, তারা রৈ রৈ করে উঠলো। তখন বাঘটা দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেছে, আর একদিকে ছুটতেই পড়বি তো পড় একেবারে সহোদর নীলাম্বর পাইকের দলবলের সামনে। তারা ফাটা বাঁশের শব্দ করে বাঘটাকে ভয় পাইয়ে দিল, নীলাম্বর পাইকের গলা খাটো, তীক্ষ্ণ-স্বরে পিলে চম্‌কানো আওয়াজ বার করলো—এ্যাইও, খবরদার! এদিকে সুরেনবাবুর বন্দুকে ভুঞ্জবাবুর কার্টিজ সমানে চলতে লাগলো ফুট্-ফুট্‌স্। বাঘটা ফিরে এসে এবার পাইক মশাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো। উত্তরা বললো—মারো, নইলে এগিয়ে আসবে। পাইক মশাই আবার বন্দুক বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, মরবে তো? উত্তরা

জবাব দিল, মরবার জন্যেই তো এয়েচে। তবে ঝাপ্‌টে ধর—ঝাপ্‌টে ধরতেই আওয়াজ হল দুম্ দুম্, এক সঙ্গে জোড়া ঘোড়া টেনে দিলেন পাইক মশাই।

সোঁদর বনের বাঘ মারা তো চাট্টি-খানি কথা নয়—অভিনন্দন জানাবার জন্য তখন সকলে হৈ হৈ করে ছুটে এল পাইক মশাইয়ের কাছে, সে কি খাতির! খাতিরের ঠেলায় পাইক মশাই বললেন, উত্তরাকেও একটু কর। উত্তরা তখন দেখছিল, যে বাঘটা তার ভাইকে খেয়েছে, এটা সেই বাঘ কিনা।

কুশোকে চেনেন? কুশো একটা বাঘ, কালির-চরে থাকে। দত্তর গাঙ্গ বেয়ে যেতে যেতে উত্তর পশ্চিম কোণে যে বড় জঙ্গল



চোখে পড়বে, ওটাই বালির চর। কুশো বাঘ হলেও তার আস্তানা কিন্তু গাছতলা নয়, দিব্যি একখানা বাড়ী আছে তার। অনেক কাল আগে, হ্যামিলটন সাহেবের আমলে সেখানে একটা পাকা কুঠি বাড়ী ছিল। তারপর কালক্রমে সে কুঠিবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। তখন প্রকৃতির খেয়ালে সেই ধ্বংস স্তূপ বনে জঙ্গলে ঢেকে যায়,

সাপ আর অন্য বন্য প্রাণীরা সেখানে এসে আশ্রয় নেয়। কুশোর মাও একদিন এসেছিল, তারপর উত্তরাধিকার বলে কুশো এখন সে সম্পত্তির মালিক।

কুশো এই বাড়ীতেই জন্মেছে, কৈশোরে একদিন মাকে হারালো। কোথায় যে তার মা চলে গেল কুশো জানে না। সমস্ত বন তল্লাস করে বেড়িয়েছে, মাকে কোথাও খুঁজে পায়নি। সেই থেকে কুশো একা থাকে। এত বড় সম্পত্তি ঘুরে পাহারা দেয়। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন জিভ বার করে দুর্বল কুশো পা চাটে। বেঁকে উল্টে যাওয়া থাবাটা একমনে চাটে। জন্ম থেকেই ওর এই দুর্দশা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। তিন পায়ে দৌড়ে হরিণ বরা ধরতে পারে না, তাই কুশো একটু মানুষ ঘেঁষা। দ্বীপে নৌকো ভিড়লেই সেই ধ্বংস স্তূপে বসে কুশো ঠিক দেখতে পায়, অমনি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে আসে। কত উপোস্ কুশোকে দিতে হয় তবে যদি কেউ এসে দয়া করে।

কালির-চরে চোরাই শিকারীরা হরিণ মারতে আসে, কুশো তাদের মধ্যে থেকে বদ লোকটাকে বেছে জীবন ধারণ করে। বাকীরা তখন হরিণ মারা মাথায় রেখে প্রাণ নিয়ে পালায়। কুশো ওইভাবে নিজে বাঁচে আর হরিণ বাঁচায়। সরকার বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে হরিণ মারা নিষিদ্ধ করেছে, ল্যাংড়া কুশোর জন্য ল্যাংড়া হরিণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমি দেখে এসেছি কুশোর দিন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না।

গোবেদের খালে জটাধারীর খবর রাখেন? জটাধারীও সাধু নয় —বাঘ। এত বুড়ো হয়ে গেছে যে ঘাড়ের লোমগুলো ঝুলে পড়েছে অনেকটা জটার মতো। সেই থেকে ওর নাম জটাধারী। জটাধারীর কাছে মন্ত্র নিতে কেউই চায় না। আমি অনেক হাঁটাহাঁটি করে, রাত জেগেও জটাধারীর দেখা পাইনি, তবে তার থাবার মস্ত দাগ দেখেছি। বৃদ্ধ জটাধারীও কুশোর মতো বনের হরিণ বাঁচায়, কিন্তু তাকে যারা বাঁচাবে তারা ধারে কাছেও আসে না। আমি অনেকবার

নিজেকে টোপ্ হিসেবে জটাধারীর সামনে ধরে দিয়েছি, জটাধারী আসেনি।

লোকে বলে জটাধারী বন-বিবির আশ্রিত, বন-বিবি ওর পিঠে চেপে বনের চৌহদ্দি ঘুরে বেড়ায়। তাই ইচ্ছে না হলে জটাধারী কাউকে দেখা দেয় না। ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত আমি জানি জটাধারী বেঁচে আছে! তারপর তো শিকার বন্ধ হয়েছে, প্রকল্প চালু হয়েছে। আশা করি নতুন প্রকল্প জটাধারী ও কুশোর একটা সু-বন্দোবস্ত করতে পারে। জটাধারী এক ধরনের তান্ত্রিক, ওর ও তো তার বলির প্রয়োজন। জানি না বৃদ্ধ ও খঞ্জের কি গতি হবে! কত হিসেব করে চললে তবে একটা বাঘ শিকারী ও অন্যান্য নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে, ঘাড়ে কেশর গজায়। সুন্দরবন দুর্গম বলেই কি এরা বেঁচে আছে, না সুন্দরবন এদের নিয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে···!

এমনি কত নাম, কত কাহিনী, কত কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে। আনন্দ ও আতঙ্ক যে বনে এমন গলাগলি করে রয়েছে সে বনের ধরন-ধারণও আলাদা। বাদার মানুষ ঘামে ও চোখের জলে সে সুখ-দুঃখ অনুভব করে। যে বাঘকে নিয়ে এত আতঙ্ক, এত কথা, সেই বাঘকেই আবার আদর করে ডাকে কত নামে। যেমন—ষ্টোর-খালির বড় মিয়াঁ, ন-বেঁকীর বড় শেয়াল, ফুলবাড়ীর হোঁৎকা-বুড়ী, নারায়ণতলীর আলুর ব্যাপারী, ছোটা-হরদির শুলো-কার্ত্তিক আর ছোটা-চামটার—ভাতার খাকী······সুন্দরবনের বাঘ যত ভয়ঙ্কর হোক বাদার মানুষের মনে এমনি এক বিশেষ আসন দখল করে বসে আছে। এত কানে কানে বলা, এত চুপি চুপি কথা, এত প্রিয় নামে ডাকা—আর কোন্ বনে আছে!

একবার দু'খানা বজরা ফরেষ্ট স্টেশন থেকে কাঠ কাটার অনুমতি পত্র নিয়ে দত্তর গাঙ বেয়ে বৈকুণ্ঠহানায় প্রবেশ পথের দু' নম্বর খালে এসে নোঙর ফেললো। তখন মরশুমের শুরু, শীতের বাতাস বইছে, মরশুমী পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে শুরু করেছে। তবু সতর্কতার কোন ত্রুটি রইলো না, কাঠ কাটার শব্দ ছড়িয়ে পড়তে

লাগলো বনে ঠক্-ঠক্-ঠকা-ঠক্। বনের নয়া হাল চালের খবর তখনো কানে আসেনি, তবু সাবধানের মার নেই! পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করা হলো। যতই আতঙ্ক থাক, বনে এলে মনটা কেমন খুশী খুশী হয়ে ওঠে। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছিল। সারাদিন ধরে কাঠ বোঝাই হতে লাগলো। ছোট ডিঙ্গিতে কাটা-কাঠ বোঝাই করে বজরায় তোলা হচ্ছিল। প্রকাণ্ড বজরা, সুতরাং ডিঙ্গি বার বার আনাগোনা করতে লাগলো, ধীরে বজরাও ক্রমশ কাঠের স্তূপে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একদল কাটছে আর একদল বজরা সাজাচ্ছে। সারা-দিন ডিঙ্গি বাওয়ার কোন বিরাম নেই, মহাজনের নিজের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে—অতএব কাজে কোথাও ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। এখন ওরা কি-ভাবে বজরায় কাঠ সাজাচ্ছিল—এখানে তার একটু বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন। কারণ আমাদের এই কাহিনী বজরার স্তূপাকার করা সেই কাঠের স্তূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

উঁচু বজরার লম্বা হাল বাওয়া হয় সাধারণতঃ একটা উঁচু কাঠের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে, এবং সেই উচ্চতা সাড়ে-তিন থেকে চার ফুটের বেশী হয় না। আর সেই পাটাতনের নীচে গোল-পাতা বা খড়ের ছাউনী দিয়ে একটা ঘর থাকে, যেখানে কাঠুরেরা রাত্রে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কাহিনীর বজরা দু'টি মেদিনীপুরের কোন ধনী ঠিকাদারের, অতএব কিছু বিশেষত্ব ছিল। যেমন—দীর্ঘ জল-যাত্রা ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ঘরটাকে তৈরী করা হয়েছিল মজবুত কাঠ দিয়ে, যার কোন জানালা ছিল না, আর ছাদটা মোটা মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল—যার উপর দাঁড়িয়ে মাঝি হাল বাইতো।

ঘরের সামনের খোলা বিস্তৃত জায়গায় স্তূপাকার করে সাজানো হত কাঠ, যাতে বজরার ব্যালান্স্ দু'ধারেই ঠিক থাকে, তা-ছাড়া কাঠ-সাজানোর মধ্যে যে কৌশল ছিল তা নিরাপত্তার দিক থেকেও যথেষ্ট। দু'ধারে সাজানো কাঠের মাঝখানে থাকতো সরু একটা পথ,

যেখান দিয়ে একজন মানুষ হেঁট হয়ে স্বচ্ছন্দে ঘরটায় আসা-যাওয়া করতে পারতো। কিন্তু শেষের দিকে সেই সরু পথটার মাথা যখন ঢাকা পড়ে যেত, তখন সেই সরু পথটাকে একটা লম্বা 'সুড়ঙ্গ' বলেই মনে হতো। যার প্রস্থ ছিল দেড় থেকে দু'হাত, আর খাড়াই কোন-মতেই তিন চাব হাতের বেশী নয়। এ হেন সুড়ঙ্গ পথে কাঠুরেরা হামা-গুঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করতো, আর প্রবেশ মুখের কাছে যে বড় নোঙ্গরটা পড়ে থাকতো, যেটা সব সময় ব্যবহার করা হতো না— রাত্রে কিন্তু সেই ভারি নোঙ্গরটাকেই টেনে এনে মুখটাকে চেপে দেওয়া হতো যাতে রাত্রে হঠাৎ কেউ ঢুকে পড়তে না পারে।

বাঘের কোন ভয় ছিল না, কারণ বজরার মুখটা ছিল যথেষ্ট উঁচু। বাঘ থাবা বাড়িয়ে উঠতে পারে না। অতএব নিশ্চিন্ত মনে কাঠুরেরা বজরা ভরিয়ে তুলতে লাগলো। এইভাবে প্রথম বজরার কাজ যখন শেষ হল, তখন প্রকাণ্ড বজরাটাকে গভীর জলে এনে নোঙ্গর করা হল। দু'পাশে নীরব, নিস্পন্দ ঘন বন, এ-পারে শব্দ উঠছে খট্ খটা খট্ কাঠ কাটার, ওপারে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে খটাখট্। দ্বিতীয় বজরায় তখন কাঠ তোলা হচ্ছে, এমন সময় একজন কাঠুরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে প্রথম বজরায় রেখে আসা হল বিশ্রামের জন্য, তাছাড়া বজরাটাও পাহারা দিতে পারবে। দুপুরের পর ওরা যখন আবার কাজে বেরিয়ে গেল, অসুস্থ লোকটির সেই বদ্ধ ঘরে একা-একা থাকতে ভাল না লাগায়, সেই স্তূপাকার করা কাঠের ফাঁক দিয়ে কোনরকমে হাল বাওয়ার ছাদে উঠে পড়লো। তারপর লম্বা হালটায় ঠেস্ দিয়ে বসে বিড়ি ধরালো, মুক্ত হাওয়ায় তার খুব ভাল লাগছিল। বিড়ি টানতে টানতে তখন সে চলে গেছে তার ঘরে, সেই সুদূর মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রামে। যেখানে তার ছেলে-মেয়েরা আর স্ত্রী তার কথাই সব সময় ভাবছে।

নির্জনে আপন মনে বসে বিড়ি টানার একটা সুখ আছে। সে সুখের সন্ধান সকলে জানেও না, সুখ কি শুধু টাকা দিয়েই কেনা যায়! সুখকে সৃষ্টি করতে হয়, তবেই সুখ সুখীর ডানা মেলে

প্রজাপতির মত নেচে ওঠে। অসুস্থ লোকটিও বিড়িতে সুখে টান দিচ্ছিল, স্বপ্নের প্রজাপতিরা তখন ডানা মেলে ধরেছে। সুন্দরবনের শির্‌-শিরে বাতাসে বনের পাতায় পাতায় ধরেছে সেই সুখের মৃদু কম্পন, তরঙ্গে-তরঙ্গে খুশীর ইসারা; তখন জ্বল্‌জ্বলে এক জোড়া চোখেও লেগেছে খুশীর মাত্‌লামি। খালের অপর তীরে নিঃশব্দে এসে দেখছিল বিড়ির সুখ টানের চেহারা, দেখছিল খুশীর ধোঁয়া কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে নদীর বুকে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

অসুস্থ লোকটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না এত-কথা, কোথায় কি আয়োজন চলছে তার খবরে সে উদাসীন! ধীরে ধীরে খালের জলে উঠলো একটা মৃদু আলোড়ন, তারপর সেই জলের-রেখা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো গোল হয়ে দূরে—আরও দূরে একেবারে বজরার হাল যেখানে জল স্পর্শ করে রয়েছে ঠিক সেইখানে। চওড়া পিচ্‌ মাখানো হালটায় মোটা মোটা কাঠের বীট্‌গুলো গুল্‌ পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল। থাবাটা সেই বীটে আটকে বাঘ তার উপর উঠবার চেষ্টা করল, বার বার ব্যর্থ হয়েও বাঘটা কিন্তু হালের হাল ছাড়লো না। পিচ্‌ মাখানো চওড়া হালটার গায়ে আঁচড়ের অনেক দাগই সে-কথার সাক্ষাৎ দিচ্ছিল। বাঘটা শেষ পর্যন্ত হালের বীটে নখ বসিয়ে শরীরটাকে জল থেকে টেনে তুলে বজরার পাটাতনের গায়ে থাবা বসাবার চেষ্টা করতেই হালটা হঠাৎ দুলে উঠলো। হালটা ঘুরে যেতেই অন্যমনস্ক লোকটা কোনরকমে টাল্‌ সামলে উঠে দাঁড়াতেই সবিস্ময়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলো—মাত্র তিন-চার হাত নীচে একটা প্রকাণ্ড বাঘ হালটা আঁকড়ে ধরে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে!

এত কাছ থেকে সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ দেখে অসুস্থ মানুষটা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে বাঘটা কিন্তু মোটেই ভয় পেল না, বরং বেড়াল ইঁদুর দেখলে যেভাবে ল্যাজ নাড়ে, সেইভাবে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। অসুস্থ লোকটি তখন বজরায় একা, হতভম্বের মত সেই দৃশ্য দেখলো। লোকটি তখন

মরিয়া হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তার মনে জোর এল, বাঘটাকে যেভাবেই হোক ফেলে দিতে হবে। প্রাণপণে হালটা দু'হাতে ধরে সজোরে ঘুরিয়ে দিতেই ঝপাং করে পড়ে গেল বাঘটা। আবার জলের রেখার গোল দাগ পড়লো এবং সেই দাগ ডাঙ্গার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। লোকটা তখন কাঁপতে কাঁপতে একটা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে সজোরে পিটতে লাগলো বজরার গায়ে, আর তার গলায় যত জোর অবশিষ্ট ছিল চিৎকার করে ডাকতে লাগলো সঙ্গীদের।

ডিঙ্গি আসতেই অসুস্থ লোকটা চিৎকার করে বাঘের ব্যাপারটা ওদের শোনাতে লাগলো। দিনের আলোয় বাঘটার দুঃসাহসের এই নমুনা দেখে সকলেই 'থ' হয়ে গেল, দুর্ভাবনায় সেদিনের মত কাঠ কাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় অসুস্থ লোকটাকে ঘরের বার হতে নিষেধ করে ওরা ডিঙ্গি নিয়ে চলে গেল কাঠ আনতে। লোকটি চুপচাপ শুয়েই ছিল, বাইরের দুনিয়ায় তখন কি ঘটছে বা ঘটবার আয়োজন চলছিল তা জানবার কথা নয়। কেন না, ঘরটায় কোন জানালা ছিল না, আর প্রায়-অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথটা দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। যে পথে সে গতকাল ছাদে উঠেছিল, সঙ্গীরা মোটা মোটা কাঠ দিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। সুতরাং কাঠের দুর্গে চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া করবারও কিছু ছিল না। সেই সাত সকালে চোখেও ঘুম নেই, সুতরাং চিন্তা এসে তাকে নিবিড় সঙ্গ দিল, চোখ দুটো তখন ছাদের কড়ি গুনছিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল, কাঠের স্তূপের ফাঁক দিয়ে সেই গতকালের বাঘ আবার এসে উঁকি দিচ্ছে। বাঘটা কখন কিভাবে উঠে এল—কিছুই বোঝা গেল না। শুধু দেখা গেল যে সে আবার এসেছে! ভীষণ আতঙ্কে বেচারার গলা বুক শুকিয়ে গেল, বিহ্বলের মত দেখতে লাগলো বাঘটার ব্যস্ততা, ভয়ে নড়া-চড়া পর্যন্ত করতে সাহস পেল না। এমন সময় ডিঙ্গি আসার শব্দ হল, ভয়ঙ্কর মুখটা যেমন হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল—তেমনি হঠাৎই আবার সরে গেল। তার

পরেই শুনতে পেল—জলে পড়ার ঝপাং একটা শব্দ। অসুস্থ লোকটি তখন সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে এসে বাঘের ঘটনাটা সঙ্গীদের আবার শুনিয়ে বললো, বজরায় সে আর থাকবে না। বিপদ একটা ঘটবেই ভেবে সকলে বজরার ছাদে এসে বাঘের জলে ভেজা দাগ পরীক্ষা করলো, তারপর ঘোষণা করা হলো, এবার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। মহাজনের কোন ওজর আপত্তি টিকলো না।

দিনের শেষে সন্ধ্যা এসে খালের জলে ছায়া ফেললো, বন-বাদাড় অস্পষ্ট হয়ে কালোয় কালো হয়ে উঠলো। মরানির ঢেউ নিঃশব্দে অন্ধকার তীরে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো। তখন গভীর রাত! সুন্দরবনের শীত অসহ্য নয়, কিন্তু সে রাতে শীতের যেন দাঁত বেরিয়েছে। অসুস্থ লোকটার সঙ্গে আরও তিন চার জন সেই ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে গভীর নিদ্রা মগ্ন।

নিশুতিরাত সাঁ সাঁ করছে, খালের ঠাণ্ডা জলে তখন নিঃশব্দে সাঁতার দিচ্ছিল বাঘটা! হালে নখ বসিয়ে এক অদ্ভুত কৌশলে বজরায় উঠে লাফিয়ে উঠলো ছাদে, তারপর কাঠের ফাঁক দিয়ে দেখে নিল ঘুমন্ত মানুষগুলোকে। আর তার নির্বাচিত শিকারকে। যার জন্য তাকে বার বার খালের ঠাণ্ডা জল অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। থাবা দিয়ে কাঠের স্তূপটাকে সরাবার চেষ্টা করলো অনেকক্ষণ, তারপর সেই স্তূপের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে পৌঁছল নোঙ্গরটার কাছে। সুড়ঙ্গ পথটা তখন চোখে পড়েছে, সর্বাঙ্গ বেয়ে জল গড়াচ্ছে—জিভেও আবার জল এসে গেল। ভারী নোঙ্গরটা দাঁতে কাঁমড়ে নিঃশব্দে সরিয়ে রাখলো একপাশে, তারপর সুড়ঙ্গ পথে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হতে লাগলো। একটা কাঠও খসে পড়লো না, এতটুকু শব্দ হল না। অবলীলাক্রমে ডিঙ্গিয়ে হাজির হল তার শিকারের সামনে।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর চোয়াল নেমে এল হতভাগ্যের গলায়, তখন কত রাত? কেউ জানে না—জানে কেবল নিয়তি! যে মেদিনীপুরের সেই জীর্ণ ঘরখানার স্বপ্ন চুরমার করবার জন্য বাঘের বেশে এল! লোকটা একটুও হাত পা ছুঁড়লো না, পাশের মানুষগুলো জানতেই

পারলো না তার মৃত্যুর মুহূর্তটি। শুধু ফিনকি দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটিয়ে পড়লো। এমন নিঃশব্দে হত্যা করতে পারে একমাত্র মানুষখেকোরাই। লোকটাকে শূন্যে দাঁতে ঝুলিয়ে ঠিক তেমনি অনায়াসে মানুষগুলোকে একের পর এক ডিঙ্গিয়ে সুড়ঙ্গের সেই সঙ্কীর্ণ পথে অর্থাৎ কাঠ না খসিয়ে, এতটুকু শব্দ না তুলে কিভাবে বাঘটা তার শিকার নিয়ে বেরিয়ে গেল—সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবো না। যখন ঘটনাটি শুনলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি, এ ত স্বপ্ন পরিমাণ—এত নিখুঁত ভাবে শিকার তুলে নিয়ে যেতে পারে—একমাত্র সুন্দরবনের দুঃসাহসী নরখাদকই······!

বেলা দ্বিপ্রহরে একখানা জেলে ডিঙ্গি খালের চরে এসে ভিড়লো। তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের জানালো, আরও কাঠ লাগবে। জ্বালানী কাঠের অভাব দেখে মাঝির সঙ্গী দু'জন দা হাতে বনে নামলো। এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বনে উঠতেই দেখতে পেল একটা শুকনো গাছ। ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনে মাঝি নৌকা থেকে মুখ তুলে দেখলো সঙ্গীরা দা কুপিয়ে শুকনো ডাল ভাঙ্গছে। রান্নার যোগাড় হাতের কাছে গুছিয়ে রেখে মাঝি ভাবলো, এই ফাঁকে স্নানটা সেরে নিই। মাথার চাঁদিতে এক খাবলা তেল ঘষতে ঘষতে জলে নেমে ঝপ্‌ঝপ্ করে গোটাকয়েক ডুব দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোলা জলে কোনমতে স্নান পর্ব সেরে যেই গামছাখানা নিংড়ে মাথা মুছতে যাবে অমনি সঙ্গী দু'জন কাঠ কাটতে কাটতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, বাঘ-বাঘ! স্নান-রত মাঝি স-ভয়ে নিজের পিছনটাই আগে দেখে নিতে গিয়েই দেখলো, দশ-বারো হাত দূরে জলের ধারে একটা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। জলে নামতে গিয়েই থমকে থেমে রয়েছে ওদের চিৎকার শুনে, একটা থাবা তখনও শূন্যে তোলা। তখন মাঝি প্রাণের দায়ে ঘোলা জল তোলপাড় করে ডিঙ্গির এধারে এসে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে। লোকটি এত ভয় পেয়েছিল যে ডিঙ্গিতে উঠতে গিয়ে পা হড়কে কাদায় মাখামাখি

হয়ে নাকানি চোবানি খেতে লাগলো। কোন গতিকে ডিঙ্গিতে উঠেই বৈঠাখানা তুলে নিয়ে কাঁপা গলায় হাস্যকর আস্ফালন করতে লাগলো বাঘকে ভয় দেখাবার জন্য।

শিকারে এই রকম বাধা পড়ায় বাঘটা ছোট ছোট কয়েকটা লাফ দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘ চলে যেতে ওদের আতঙ্কিত মুখে আবার সাহস ফিরে এল, মাঝি জলে নেমে চটপট কাদা ধুয়ে উঠে পড়লো ডিঙ্গিতে। তখন প্রথম সঙ্গী বন থেকে চিৎকার করে বললো, জান মাঝি—বাঘ যখন জলে নামবার জন্য থাবা বাড়ায় তখনই সে সর্ব-প্রথম তাকে দেখতে পায়। দ্বিতীয় জন বললো—না, তা ঠিক নয়, বাঘ যখন খালের পাড়ে এসে দাঁড়ায়—তখনই সে আগে দেখতে পায়। ভর-দুপুর বেলা একটা বাঘকে এত ফাঁকায় দেখে এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠতে পারেনি। মাঝি তখনও বৈঠা হাতে ডিঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, ভিজে কাপড়টা পর্যন্ত ছাড়েনি। বললো, এই নিয়ে দু'বার হল আজ সকাল থেকে, হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছি—তাড়াতাড়ি নেমে আয়। বলেই আঁৎকে উঠলো. সর্বোনাশ! ভাত তখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে, দুর্গন্ধটা এতক্ষণে নাকে এল। মাঝি তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামিয়ে খালের জলে ধুতে লাগলো, আবার নূতন করে চাল মাপতে হবে।

মাঝি তখনও জানে না কতজনের চাল মাপতে হবে। তখন প্রথম সঙ্গী কাঠের বোঝাটা কাঁধে নিয়ে ডিঙ্গিতে ফিরে এল। দ্বিতীয় জন খালের ধারে এসে বললো, তার পায়ে কাঠের একটা গোঁজ ফুটে গেছে। বলে যেই মাথা নীচু করে পায়ের জখম দেখতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘটা কোথা থেকে ছুটে এসে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ হল, তারপরেই মাঝি দেখলো-চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই লোকটাকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা। সঙ্গীর কাঠের গোঁজ লাগা জখম পা দুটো লুটোতে লুটোতে টেনে-হিঁচড়ে চলেছে বনের ডাল পালার উপর দিয়ে

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না, সঙ্গীর নাম ধরে অদ্ভুত

একবারও ডাকলো না কেউ। সেই স্বল্প জলে এলো পাথাড়ি বৈঠা মেরে মহা-আতঙ্কে ছুটলো বড় নদীর মুখে। হাঁড়িতে আর চাল নেওয়া হল না।

ওরা যখন ভাবলো বাঘ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে, ঠিক তখনই বাঘটা দ্রুত বনের চৌহদ্দি বেড় দিচ্ছিল। খালের এপারে আসতেই প্রথম জন নেমে গেল, আর দ্বিতীয় জন মাথা হেঁট করে বাঘটাকেই যেন আহ্বান জানালো। সুন্দরবনের দুঃসাহসী বাঘ কি এত সহজে হটবার পাত্র··· !

আরেকটা ঘটনা। ভৈরবরা নৌকোর ছইয়ের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বসে ভাবছিল, এ-হেন খারাপ সময় ওরা বড় একটা দেখেনি। অবাক হল—সুন্দরবনে এমন দুর্দিনের কথা কেউ কখনও ভাবতে পারছে যে, খালে বিলে জাল ফেললে মাছ ওঠে না !

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ, ভৈরবরা হ্যারিকেন জেলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছু হোক না হোক, পেটে তো দু'মুঠো দিতেই হবে। একে তো মন মেজাজে সুখ ছিল না, তার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কারুরই খেয়াল ছিল না, নৌকোটা কখন তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যখন হুঁশ হল—তখন নৌকো প্রায় তীরে এসে ঠেকেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে সর্বনাশ ! রাতের অন্ধকারে নৌকো সুন্দরবনের তীরে পৌঁছলে কি ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কা করে ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো।

তখন ভৈরব বৈঠা মেরে নৌকোটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথাস্থানে বসে বললো, গেরাপিটা তুলে নেওয়ার জন্য। একজন গেরাপির দড়িটা ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করে জানালো, গেরাপি বনের কোনো গাছে জড়িয়ে গেছে। তখন সবাই মিলে দড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলো, কিন্তু এক চুলও তাকে সরাতে পারলো না। কী ভীষণ অবস্থা ! ভৈরব হ্যারিকেন নিয়ে তখন বাধ্য হয়ে বনে নামবার উপক্রম করতেই সঙ্গীরা ওকে বাধা দিয়ে বললো, ক্ষেপেছো না কি ? এত রাত্রে খালি হাতে কেউ বনে যায় ? তখন ভৈরব রাগ

করে বললো, তাহলে কি করবি? সারা রাত এ-ভাবে বনের ধারে বসে থাকবি, আর বড়-শেয়াল এসে রসগোল্লার মত গপ্ গপ্ গিলুক। বোকার মত বাক্ বিতণ্ডা চলতে লাগলো।

এমন সময় সেই ভাঙ্গা জ্যোৎস্নায় ওরা দেখতে পেল, একটা বাঘ বনের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। আতঙ্কে ওরা চীৎকার করতে ভুলে গেল। বাঘটা তখন গুঁড়ি মেরে বন থেকে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ ভৈরব বৈঠা তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, কে যেন ওর ভিতর থেকে শব্দটা ছুঁড়ে মারলো। তখন সঙ্গীদেরও চেতনা ফিরে এল। সমস্বরে চীৎকার শুরু করে দিল, বৈঠা তুলে আস্ফালন করতে লাগলো, আর হ্যারিকেনটায় যথেষ্ট জোর দিয়ে আলোটাও বাড়িয়ে তুললো। এদিকে ভৈরবও বুদ্ধি খাটিয়ে আলোটাকে একেবারে বনের কিনারায় বসিয়ে দিয়ে বাঘ তাড়াতে লাগলো।

অন্য কোন অঞ্চলের বাঘ হলে এত কাণ্ডের পর নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিত, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ ঘাগু মাল! সব রকম পরিস্থিতির সঙ্গেই তার মোকাবেলা হয়ে গেছে, সুতরাং সামান্য একটু আড়াল নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলো, আর হাওয়াটা বড় গরম হয়ে উঠেছিল—তাকে একটু শান্ত হওয়ার সময় দিতে হবে। সারা রাতটাই তো পড়ে রইলো।

এদিকে ভৈরবদের অবস্থা তখন সসেমীরে, সমস্ত রাতটাই এইভাবে বন্দী হয়ে থাকতে হবে প্রাণ হাতে নিয়ে! নৌকো তীর থেকে এক চুলও সরান গেল না, দড়ি ধরে অনেক টানাটানি করেও কিছু হল না। তখন রক্ত হিম হয়ে আসছিল, ওরা বুঝতে পারছিল—এটা বাঘেরই কীর্তি। ওদের অন্যমনস্কতায় কখন নোঙরটা বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গাছের গোড়ায় জড়িয়ে রেখেছে। রান্না খাওয়া আর হল না, প্রাণ হাতে নিয়ে অসহায় মানুষগুলো সজাগ, সতর্ক থাকতে থাকতে আতঙ্ক ও হতাশায় যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে সেই আতঙ্কের অবসান হল। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই

দেখতে পেল বাঘটা স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। দূরে হরিণের টাউ টাউ শব্দ ভেসে এল, আবার মাথার উপর দিয়ে সলুইরা উড়ে গেল। ভোর হল! একে তো ভোর হওয়া বলে না, নব-জন্ম লাভই বলা উচিত। সারারাত অভুক্ত থেকে লোকগুলো যেন এক রাতে বুড়ো হয়ে গেছে। অনেক বেলায় বনে গিয়ে দেখে নোঙরটা একটা শক্ত ঝোপের গোড়ায় জড়িয়ে রয়েছে, আর ঠিক তার পাশেই বাঘ বসেছিল। তার সব নিদর্শনই তখনও সেখানে ফুটে রয়েছে। এ ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! বাদা অঞ্চলে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, যার খবর সহরে বসে আমরা পাই না।

এই রকম অজস্র ঘটনা সুন্দরবনে নিত্য ঘটে। মরশুমের শুরুতে ওরা আসে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন খালে নোঙর ফেলে জেলে-ডিঙ্গি, নৌকো আর বজরা। সুন্দরবনের দুঃসাহসী বাঘ সন্ধানে ফেরে কোথায় কেমন করে তার শিকার সংগ্রহ করবে। প্রায় প্রত্যেক দল থেকেই একজন না একজন বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায় এবং প্রত্যেকটি মৃত্যুরই নিজস্ব শোচনীয় কাহিনী আছে। বন-বিভাগ তার কতটুকু খবর রাখে! সুন্দরবনে বে-পাশীর সংখ্যাই বেশী এবং বে-পাশীর দল থেকে মানুষ মারা পড়লে বন-বিভাগে কোন খবরই দেওয়া হয় না। ফলে সংবাদপত্রের পাতায় কোথাও বে-পাশীর উল্লেখ করা যায় না।

সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত ধূর্ত, চতুর ও দুঃসাহসী—এই নির্মম সত্যটি বোঝানর জন্যই কাহিনীগুলোর অবতারণা করেছি। এবং আগেও বলেছি, অন্যান্য বনের মত সুন্দরবনেও যথেষ্ট কু-সংস্কার রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই মারাত্মক বাঘের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির ভয়ও যুক্ত হয়ে পড়ে, তখনই ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। যেমন বেগো ভূতের কথা আগেই বলেছি। এই বিংশ শতাব্দীতে রকেটের যুগে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতে বলা আহাম্মুকী। কারণ—জোর করে কারও মনে বিশ্বাস আনা যায় না। ঘটনার বিবর্তনেই মানুষ ঠেকে শেখে, যার ব্যাখ্যা সব সময় পাওয়া যায় না, কাউকেও বলে

বোঝান যায় না। শুধু অভিজ্ঞতা দিয়েই তা অনুভব করতে হয়, আর সঞ্চিত সেই গোপন ভাণ্ডার গোপনে থাকাই বোধ করি বাঞ্ছনীয়—নইলে সমালোচনার ঝড়ে পায়ের তলায় আর মাটি পাওয়া যায় না। যুগ যে অবিশ্বাসীর।

গোসাবা হয়ে একটি স্থানীয় শিকারীর দল কোন একটি দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল (বিশেষ কারণে শিকারী ও দ্বীপের নাম করলাম না)। সময়টা ছিল শীতের মাঝামাঝি, প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্তর ও যথেষ্ট পানীয় জল নিয়ে রাতের আঁধারে সোঁ-সোঁ করে নৌকো ছুটে চললো ভাঁটার টানে। সঙ্গের ছোট্-টা অর্থাৎ ছোট-ডিঙ্গিটা আরও এক-শো গজ আগে আগে যাচ্ছিল। শিকারের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে ছিল খান-কয়েক দো-নলা ও একটা এক নলা বন্দুক। এরা রাইফেলের ব্যবহার জানে না, রাইফেলের একটিমাত্র গুলির উপর ভরসাও করতে পারে না। টোটার গুলির (এল. জি.) উপর এদের আস্থা অনেক।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলা যেতে পারে—তারা বন-ঘুঘু। সুন্দর-বনের বন্য বাদা অঞ্চলের এমন কোন জায়গা নেই—যা ওদের অজানা। এমন কি এ অঞ্চলে এমন অনেক খাল-বিল যা ম্যাপে নেই, বন-বিভাগও যার খবর রাখে না, সেইসব দুর্গম অজানা জায়গা তাদের নখ দর্পণে। এতসব জানা সত্ত্বেও শিকারীর পাকা তালিমের অভাবটুকুই মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে দেখা দিত, তবু উদ্যমে কখনও ভাঁটা পড়েনি।

ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই নির্দিষ্ট দ্বীপে ওরা এসে পৌঁছল। বড় নৌকো তখনও খালে প্রবেশ করেনি। দ্রুতগামী ছোট্টাই আগে এল, তারপর জলের ধারের একটা বড় গাছে দড়ি বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগলো। সেই ফাঁকে দলের একজন গাছে উঠে দেখতে লাগলো নৌকো আসতে আর কত দেরী। ডিঙ্গির অন্যান্য মাঝির মধ্যে এক বন্দুকধারী শিকারী ছিল, যখন গাছের উপর থেকে লোকটা বললো—বড় নৌকো পৌঁছে গেছে, তখন শিকারী বন্দুক হাতে তীরে নেমে দাঁড়াল ও গাছের উপরের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো, সে হরিণ

দেখতে পাচ্ছে কিনা। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে শব্দ হল। দূর থেকে বুড়ো শিঙ্গেলের ডাকের মত একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ। শিঙ্গেল হরিণ যখন খুব বুড়ো হয়, তখন তার গলার স্বর অত্যন্ত মোটা ও কর্কশ হয়ে পড়ে এবং শব্দটা পেটের মধ্য থেকে উৎপত্তি হয়ে যখন স-জোরে কণ্ঠনালী দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন স্বরগমের কোন ত্রুটি বা বয়োবৃদ্ধির জন্যই শব্দ প্রসারে কোনপ্রকার ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। ফলে অনেকটা চাপা অস্পষ্ট ভাঙ্গা 'ব্যা' শব্দের মত শোনায়। আমি দেখেছি অত্যন্ত বুড়ো শিঙ্গেল ডাকার সময় যথেষ্ট কষ্ট পায়, শরীরটা কেমন যেন বেঁকে দুমড়ে ওঠে। সুন্দরবনের হরিণদের চর্বির আধিক্য বেশী, হয়তো এই মাত্রাধিক্য চর্বিই তার একটা কারণ।

যাইহোক—হরিণটার শুধু ডাক শোনা গেল, তখনও তাকে চোখে দেখা হয়নি, তার হাঁটা বা গাছপালার শব্দ কানে আসেনি। সেই শব্দ অনুসরণ করে শিকারী নিঃশব্দে বনে প্রবেশ করে হরিণের চিহ্ন খুঁজতে লাগলো। এদিকে বড় নৌকো তখন পৌঁছে গেছে, ডিঙ্গির পাশে নৌকো বেঁধে বনের খবরা-খবর করলো।

গাছের উপরের লোকটি যখন জানালো—একটা বড় শিঙ্গেলের ডাক শুনে ডিঙ্গির শিকারী একাই তার পিছনে চলে গেছে, তখন নৌকোর অন্যান্য শিকারীরা চটপট তীরে নেমে বন্দুকে গুলি ভরে প্রথম শিকারী কোন দিকে গেছে তার আন্দাজ নিয়ে নিঃসাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের আড়ালে। ভিজে বনের মধ্যে দ্রুত হেঁটেও প্রথম শিকারীর দেখা পেল না। এমন সময় যে লোকটা গাছে উঠেছিল—সে হঠাৎ বলে উঠলো, এই মাত্র 'ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ হল। লোকটা ভালভাবে কান পেতে দাঁড়াল শব্দটা আর-একবার শোনবার জন্য, কিন্তু আর কোন শব্দ হল না। দলের লোকেরা বললো, ভুল শুনেছে, কই, আমরা তো কোন শব্দ শুনিনি! লোকটি তখন বনের একটা দিক দেখিয়ে বললো, শব্দটা ওই দিক থেকে উঠেছে। তখন সেই দিকেই হাঁটা আরম্ভ করলো। অনেকটা খুব হন্ হন্ করে যেতেই দূর থেকে দেখতে পেল প্রথম শিকারী খুব সন্তর্পণে একটা ঝোপ থেকে

আরেকটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওরা ভাবলো, নিশ্চয়ই বুড়ো শিঙ্গেলটার সন্ধান পেয়েছে। তখন সেই দূরত্বটুকু কভার করবার জন্য জোরে পা চালিয়ে দিল।

ওরা দ্রুত হেঁটে যখন ঝোপটার কাছে এল, তখন প্রথম শিকারী আবার অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওরা ভাবলো বুড়ো শিঙ্গেলটাকে ও ধরবে এবং সেই আনন্দে তার নাগাল পাওয়ার জন্য হাঁটা থামালো না।

এইভাবে হরিণের জন্য হন্যে হয়ে ওরা বন থেকে বনে ঘুরতে লাগলো, তখন গাছের মাথায় সবে রোদের আলো এসে পড়েছে। শিঙ্গেলের আশা বিশেষ নেই ভেবে দলের লোকেরা ঠিক করলো শিঙ্গেলের মায়া ছেড়ে এবার 'ওয়াড়ী' করতে হবে। অতএব পৃথক শিকারীকে থামানো দরকার ভেবে যেই 'কুই' দিতে যাবে, অমনি দলের একজন সভয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল—বাঘের পায়ের টাট্‌কা ছাপ! বাঘটা এইমাত্র পথটা পার হয়েছে। সেই সময় প্রথম শিকারীর কাছ থেকে ওদের দূরত্ব ছিল মাত্র বিশ গজের মতন। বাঘের ব্যাপারটা প্রথম শিকারীকে ডেকে বলার জন্য আবার যেই 'কুই' দিতে যাবে, অমনি দেখলো—ডান দিকের বন থেকে একটা বাঘ নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়াল, সেই বিশ গজ দূরত্বটার ঠিক মাঝ বরাবর।

এই অভাবনীয় ব্যাপারে পিছনের শিকারীরা এত হক্‌চকিয়ে গেল যে, বন্দুক পর্যন্ত তুলতে পারলো না। বাঘের ঠিক দশ গজ আগে অত্যন্ত সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে তখনও এগিয়ে চলেছে প্রথম শিকারী। গুলি ছুঁড়লেই শিকারীর গায়ে লাগার সম্ভাবনা, অথচ বাঘটা ঠিক সেই লাইনেই এসে দাঁড়াল।

সুন্দরবনের দুঃসাহসী নরখাদক সেই অপূর্ব সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লো না। দলটার উপর একটা তাচ্ছিল্যের ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেই নিঃশব্দে কয়েকটা দ্রুত পা ফেলেই পৌঁছে গেল প্রথম শিকারীর ঠিক পিছনে, তারপর মারাত্মক থাবা দুটো তুলে দিল তার কাঁধে।

প্রথম শিকারী হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে বাঘটা মাথাটা অল্প একটু কাৎ করে কামড়ে ধরলো তার গলাটা, কঠিন চোয়াল চেপে বসে গেল। এতটুকু ঝটাপটি নেই, আর্তনাদ নেই, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত হল না আক্রমণকারী বা আক্রান্তের তরফ থেকে—অথচ একটা মৃত্যু ঘটে গেল। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ডের খেলা, অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মাঝে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে সাঙ্গ হল, এতগুলো বন্দুক থেকে একটা গুলিও ছুটে গেল না। আতঙ্কগ্রস্থ বিহ্বল শিকারীরা মাত্র দশ গজ পিছন থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখলো সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য—যেন এক যুগ ধরে… !

আশ্চর্য হওয়ার তখনও বাকি ছিল, বাঘটা যখন আবার মাটিতে নেমে দাঁড়াল—তখন দেখা গেল অতবড় লোকটা কুঁকড়ে যেন একটা শিশুর মত ছোট হয়ে গেছে। হাত-দুটো বুকের কাছে জড় করা, পায়ের শিরায় টান ধরায় বেঁকে-দুমড়ে উপরে গুটিয়ে রয়েছে, গলাটা কামড়ে থাকায় মুখটা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাঘটা যখন চলতে আরম্ভ করলো, তখন তাল-গোল পাকানো প্রাণহীন দেহটা মাটির উপর একটা নীরব পেণ্ডুলামের মত শুধু দুলতে লাগলো।

বাঘটা চোখের আড়াল হতেই পিছনের হতভম্ব শিকারীরা হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ করতে আরম্ভ করলো। সেই আওয়াজ শুনে নৌকোর মাঝিরা ভাবলো অনেক হরিণ মারা পড়েছে। ভরা উত্তেজনায় পাগলের মত দল-বেঁধে ছুটতে লাগলো সেই দিকে—যেদিক থেকে বন্দুকের শব্দ হয়েছে। বন-বাদাড় ভেঙ্গে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে দেখলো, শিকারীরা তখনও আকাশের দিকে বন্দুকের নল উঁচু করে নির্বাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হরিণের কোন চিহ্ন নেই। উত্তেজিত মাঝিদের আর তর্ সইছিল না, হতভম্ব লোকগুলোকে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে, হরিণ কই ?

এতক্ষণ পরে শিকারীদের হুঁশ ফিরে এল, বোবা গলায় ফুটলো ঘড়-ঘড়ে আওয়াজ, আর্তনাদ করে উঠলো—হায়-হায় করে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে কোন-রকমে উচ্চারণ করলো, প্রথম শিকারীকে

এইমাত্র বাঘে নিয়ে গেল! তারপর বুক চাপড়াতে লাগলো, এতগুলো বন্দুক থাকতেও তো কিছু করতে পারলাম না-রে! বলে কাঁদতে লাগলো। একজন শিকারী বমি করতে লাগলো, আর বাকি-সকলে চলৎ-শক্তিহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লো সেই কাদার উপর। কান্নার প্রবল দমকে হিস্ট্রিয়া-রুগীর মত কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো, চোখের দৃষ্টি কেমন শূন্য হয়ে গেল। মনে হল—লোকগুলো বুঝি মারাই পড়বে এক্ষুণি। সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করতে লাগলো।

যে লোকটা গাছে উঠেছিল ও ঘোঁৎ শব্দটা শুনেছিল, সে অতিকষ্টে সঙ্গীদের সাহায্যে সেই পঙ্গু, বিপর্যস্ত দলটাকে কোনরকমে শেষ পর্যন্ত নৌকোয় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর দা-হাতে তিনজন সঙ্গী নিয়ে রক্তের দাগ ও বাঘের চিহ্ন অনুসরণ করে অকুস্থলে পৌঁছল, সেখানে বাঘ মৃতদেহ রেখে বিশ্রাম করছিল। লোকগুলো আচমকা ছুটে এসে দা উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু দুঃসাহসী বাঘটাকে মৃতদেহের কাছ-ছাড়া করা সম্ভব হয় নি। বাঘটা রক্ত-জমাট করা এমন গর্জন করে উঠলো যে, মৃতদেহ উদ্ধার-কারীরা পালাবার আর পথ পেল না। তখন বাঘটা মৃতদেহ দাঁতে ঝুলিয়ে বনের অভ্যন্তরে চলে গেল।

সকালের সেই অশুভ মুহূর্তে একটা অস্পষ্ট শব্দকে শিঙ্গেলের ডাক মনে করে শিকারী জঙ্গলে প্রবেশ করে কি দেখলেন? শিঙ্গেল বা শিঙ্গেলের খুরের চিহ্ন, না—বন-জঙ্গলের ডাল-পালার নড়া-চড়া? কোন্ চিহ্ন অনুসরণ করে শিকারী এতক্ষণ বনে-বনে ঘুরছিলেন, শিঙ্গেলের না বাঘের? এর উত্তর পাওয়া যায় নি। কারণ যে উত্তর দেবে, সে তখন বাঘের দাঁতে ঝুলে গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিকে জানা আছে—বাঘ হরিণ-শম্বরের ডাক নকল করতে পারে, এমন কি মানুষকে পর্যন্ত নকল করে। এ-ক্ষেত্রে বাঘটাই যদি শিঙ্গেলের ডাক নকল করে থাকে তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওই অঞ্চলের লোক বলে, বাঘটা মায়া-বাঘ,—হরিণের রূপ ধরে শিকারীর দিক্‌ভ্রম্ ঘটায়, তার লালসা বাড়িয়ে তোলে—তারপর পিছন থেকে নিজ-মূর্তি ধারণ

করে গলা কামড়ে ধরে। এই উক্তির কোন জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,—তবে জঙ্গলে অনেক অঘটন ঘটে। কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত মানুষ অলৌকিক-শক্তির বড় ভক্ত! ওরা জঙ্গলে এসে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না, 'কুই' দিয়ে ইসারা করে, এমন কি বনে এসে বাঘের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না—বলে বড়-শেয়াল, বলে বড়-মিয়া···!

সুন্দরবন সম্বন্ধে এমন অজস্র কাহিনী আছে—যা বলে শেষ করা যাবে না। আমি কয়েকটা মামুলী কাহিনী শুধু তুলে ধরলুম, যা থেকে মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নোনা-বাদায় কি অসম্ভব অঘটন ঘটে! সংবাদপত্র মারফৎ সাধারণ মানুষ শুধু এইটুকুই জানেন—সুন্দরবনে বাঘে মানুষ মারে, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা নিজস্ব শোচনীয় কাহিনী আছে! অবশ্য অতি-রঞ্জিত যে কিছু নেই, সে-কথা বলি না। কথায় বলে—যা রটে, তার কিছুটা তো বটে···!

গোসাবার তীরে সজনেখালি ফরেষ্ট-স্টেশন। সুন্দরবনের সব থেকে বড় ফরেষ্ট-অফিস, তারই অদূরে 'পাখিরালয়ের' ওপারে যেতে যেতে যে বিস্তীর্ণ জলরাশি চোখে পড়বে সেখানে গোসাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিত্যা-নদী। সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত জলরাশির পূর্ব-দিকের উঁচু পাড়ের উপর লাল রঙের টিনের যে চালাটা সর্ব-প্রথমেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ওটাই বিত্যা-চেক্-পোষ্ট। এখানে নৌকো চেকিং হয়, কিন্তু তার আগে কাগজপত্রের বিবরণ লিখিয়ে আসতে হবে সজনেখালি ফরেষ্ট-স্টেশনে।

মাতলা নদীর একটা শাখা সজনেখালি ও বিত্যা চেক্-পোষ্টের মাঝ-বরাবর ঝড়খালির বুক-চিরে এসে যেখানে পড়েছে, সেখানে জাহাজের দিক-নির্ণয় করার যে মস্ত বড় নিশানাটা অবহেলায় অকেজো হয়ে পড়ে ছিল এতকাল, তারপর ঘূর্ণী-ঝড়ের কবলে পড়ে একদিন বেঁকে ইংরাজি 'ইউ' আকার ধারণ করে আর একটা বড় ঝড়ের অপেক্ষায় তখনও টিঁকে ছিল। মাতলা যার তীরে দু'বেলা আছড়ে

পড়ে বিছা নদীতে গিয়ে মিশেছে, তারই অদূরে দেখবেন তরঙ্গ-সঙ্কুল ঘন-নীল জলরাশির মধ্যে মোচার-খোলার মতই তুলে-তুলে চলেছে একখানি নৌকো। তার লক্ষ্য ওপারের লাল-বালি, অর্থাৎ ন'-বেঁকির ট্যাক্ বা টেক্। ন'-বেঁকির খালে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে নৌকোর আরোহীরা মাছ ধরতেই যাচ্ছে এবং ওরা যে বে-পাশী তার প্রমাণ সজনেখালি বা বিছা-চেক্-পোষ্টে সন্ধান করলেই বুঝতে পারা যাবে।

ওপারের বন্য বাদা-অঞ্চল বন-বিবির রাজ্য, তাঁর খড়ে ছাওয়া মন্দিরও ছড়িয়ে বনের প্রত্যেকটি দ্বীপে। বাদার মানুষ বন-বিবিকে স্মরণ না করে বনে প্রবেশ করে না। বন-বিবির পূজো দেয় প্রত্যেকটি কাঠুরের নৌকো, জেলে-নৌকো আর মৌলিদের নৌকো। এদের মানৎ করা মুরগী চ'রে বেড়ায় বনে। বন-বিবি রক্ষা করেন বনের প্রাণীদের আর যারা তাঁর স্মরণার্থী। যারা বনে এসে বনের বিধি-নিষেধ মানে না, বন-বিবির আদেশে তাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বন তখন শাসন করে নির্মম-ভাবে। দক্ষিণ রায়ের বাহন্ সদা-জাগ্রত প্রহরী সেই ভয়ঙ্কর নিরালার রাজ্যে।

বনে এসে কখনও রেষারেষি করতে নেই, বাঘ মারবোই মারবো—এমন দম্ভ বনে এসে করতে নেই। বন সম্বন্ধে 'সাপট্' করার বিধি কোন দুর্বল মানুষের নেই। যারা এ বিধান লঙ্ঘন করে বন তাদের কখনও ক্ষমা করে না, বন-বিবির রোষে দুর্গতির আর অন্ত থাকে না।

তাজউদ্দিনেরও দুর্গতির সীমা ছিল না। এ কাহিনী তাজউদ্দিনের—কারণ সে বনের শাসন মানতো না, দাম্ভিক—এঁকেল্-সেঁড়ে, আর রেষারেষিতে তার কোন জুড়িও ছিল না। বনে প্রবেশ করবার জন্য যে অনুমোদন-পত্রের প্রয়োজন হয়, সে তার কোন ধার ধারতো না। এতরাত্রে মোচার খোলার মত দুলতে-দুলতে যে নৌকোখানা নিঃশব্দে দাঁড় বাইছিল তার মালিক ওই বেপরোয়া তাজউদ্দিন, ন'-বেঁকির খালে চলেছে রাত-দুপুরে মাছ ধরতে! তাজউদ্দিন গ্রাম্য শিকারীও বটে, এক-নলা একটা বিলিতী বন্দুক কিনে সাহস যতটা না বাড়লো দম্ভ

বেড়েছিল ষোল-কলায়। বন্দুকটার জোড় ভেঙ্গে মাছ-ধরার জালের মধ্যে লুকিয়ে অন্ধকারের আড়ালে নির্বিঘ্নে পাড়ি জমিয়েছিল। সারা-রাত দাঁড় বেয়ে খালের মুখে এসে যখন পৌঁছল, তখন ভোর হয়ে গেছে।

দিনের আলোয় বে-পাশীরা বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে পিটেলের ভয়ে, নৌকোটাকে শিসের শেষ-মাথায় টানতে-টানতে এনে কাদার উপর তুলে দেয়, যেখানে পিটেলরা তার কোন সন্ধানই পায় না। তারপর গেরাপিটা ভাল করে কাদায় পুঁতে নিঃশব্দে উঠে পড়ে বনে। বন্দুকে গুলি ভরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলে হরিণের সন্ধানে। চলতে চলতে এক সময় পেয়ে যায় একটা হরিণের সিঁড়ি। হরিণের অসংখ্য টাটকা খুরের চিহ্ন এঁকে বেঁকে চলে গেছে বনের গভীরে। বনের পথ বে-পাশীদের নখ-দর্পণে। সেদিন তাজউদ্দিনের দল ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে গেল, তবু হরিণের কোন ঝাঁক নজরে এল না। সুন্দর-বনে এমন ঘটনা সত্যই বিরল, প্রত্যেক দ্বীপেই প্রচুর হরিণ দেখতে পাওয়া যায়।

তাজউদ্দিনরা ভাবলো যাত্রার কোথাও গলদ রয়ে গেছে, নয়তো এ দ্বীপে হরিণের মড়ক লেগেছে। মড়ক লাগলে তো মরা হরিণের কঙ্কাল চোখে পড়তো? বাঘের অত্যাচার হঠাৎ বেড়ে গেলে হরিণের দল আতঙ্কে দ্বীপ ত্যাগ করে অন্য বনে চলে যায়, সে কথা চিন্তা করতে ভাল লাগলো না। তাজউদ্দিন একটা ভাল গাছ দেখে উঠে বসলো, তারপর ওর দলের যে ভাল 'কুই' দিতে পারে তাকে বললো 'কুই' দেওয়ার জন্য।

বানরদের সঙ্গে হরিণের এক আশ্চর্য সখ্যতা আছে। হরিণের ঝাঁক যখন কেওড়া পাতা খাওয়ার জন্য গাছ তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন বানরেরা ডালে লাফালাফি করে ডাল ঝাঁপিয়ে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে বন্ধুদের খাওয়ায় সাহায্য করে। বিনিময়ে কখন কখন ওদের পিঠে চড়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসে। যখন হরিণদের দেখা পাওয়া যায় না, তখন বানরেরা 'কুই' দিয়ে হরিণ ডাকে। আর সেই

ডাক শুনে হরিণ পাতা খাওয়ার লোভে আসে। মানুষ সেই 'কুই' দেওয়া শিসে গোপনে হরিণ মারে, তাজউদ্দিনরাও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট ওস্তাদ।

অনেকক্ষণ 'কুই' দেওয়া হল, কিন্তু কোন হরিণই এল না পাতা খাওয়ার লোভে। সবই যখন বৃথা হল তখন দিনের আলো গাছের মাথায় উঠে এসেছে, ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল সেই ঘোর অস্বস্তির মধ্যে। নৌকোয় ফিরে আসতে হল। তারপর জোয়ারের জল শিসের মধ্যে প্রবেশ করে বনের কিনারা ছাপিয়ে উঠল। তাজউদ্দিনরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, লগি ঠেলে বেরিয়ে এল বড় নদীর মুখে এবং তীর থেকে যথেষ্ট দূরত্বে গেরাপি ফেলে দিল সারা রাতের মত। বে-পাশীরা সব-সময়ই ঝাড়া-হাত-পা, অযথা বোঝা বয় না। দু'পালী করে চাল ও সামান্য তেল নুন মশলা সঙ্গে এনেছিল, বনে এলে ওরা শুধু মাংস খায়। মাংস বিহনে সে রাতে ওরা লঙ্কা পুড়িয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লো। সারাদিন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা করেও হরিণের দেখা না পেয়ে মেজাজে সুখও ছিল না। প্রথম অভিযানে এমন বাধা পেয়ে অনেকেই হতাশ বোধ করতে লাগলো, কিন্তু বুড়ো করিম আলি সারারাত চোখের দু'পাতা এক করতে পারেনি, দুর্ভাবনার অছিলায় সারারাত জেগে নৌকো পাহারা দিয়েছে। দলের মধ্যে ওই কেবল ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবার শক্তি ধরে। আর মন্ত্র তন্ত্র! সে কথা ও অস্বীকার করলেও দলের লোক জানে—করিম আলি 'বাওয়ালী'। বাওয়ালীকে বাদ দিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে ওয়াড়ী হয় না, অন্ততঃ দক্ষিণের মানুষ বনে প্রবেশ করে না।

পরের দিন সকালে আবার শিসের মধ্যে নৌকো যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে হরিণের একটা সিঁড়ি ধরে ট্যাক্ পর্যন্ত বার বার ঘোরা-ফেরা করা সত্ত্বেও যখন কিছুই হল না, তখন ক্লান্ত হয়ে ওরা খালের ধারে বসে জিরিয়ে নিল, তারপর আহারাদি সেরে পরামর্শ করতে বসলো অন্য কোন দ্বীপে যাওয়ার জন্য। দিনের আলোয় পিটেলের ভয়ে ওরা বড় নদীতে আসতে পারে না। তাই অপেক্ষা করতে লাগলো কতক্ষণে

অন্ধকার নেমে আসবে, দূর হবে পথের বাধা বিঘ্ন। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, তারপর সেই সন্ধ্যা নেমে এল ধীরে ধীরে। শিসেতে তির্-তির্ করে জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় অত্যন্ত নিকট থেকে ডেকে উঠলো হরিণ টাউ টাউ করে।

মুহূর্তে পরিস্থিতির যেন দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল, তাজউদ্দিন ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে দলটাকে নিস্তব্ধ হওয়ার ইঙ্গিত করলো। তারপর বন্দুকটা নিয়ে হেঁট হয়ে দ্রুত অন্তর্ধ্যান করলো বনের সেই দিকে, যে-দিক থেকে হরিণের ডাকটা শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। নীরব নিস্পন্দ বন, কোথাও কোন শব্দ নেই, সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল। দম্ বন্ধ হওয়া মানুষগুলো যেন স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো বন-বাদাড়ের উপর। চমৎকার হরিণটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে কাঁধে করে বয়ে আনছিল, আর একজন মাঝি নৌকোটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছিল বড় নদীর মুখে।

কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। নৌকো নদীর মুখে আসতেই দেখা হয়ে গেল পিটেলের সঙ্গে। বনের মধ্য থেকে সেই দৃশ্য নজরে পড়তেই বুদ্ধিমান করিম আলি মুহূর্তের মধ্যে বন্দুকটা তাজউদ্দিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা গাছের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। তারপর মারা হরিণটাকে একটা ঝোপে টাঙ্গিয়ে রেখে নেমে এল হাসি মুখে এক বোঝা কাঠের বাণ্ডিল মাথায় নিয়ে। জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাসী চালিয়ে সন্দিগ্ধ পিটেল যখন ফিরে গেল, তখন অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেছে। সারাদিনের হয়রানির পর আবার বনে নামতে তখন অনেকেই গর-রাজি, কিন্তু তাজউদ্দিন হম্বি-তম্বি করে অনেক আস্ফালন করলো, বাঘের ভয়কে নস্যাৎ করলো কিন্তু হুঁশিয়ার করিম আলির মুখের উপর কিছু বলতে না পেরে গোঁজ হয়ে রইল। সে রাতেও লঙ্কা টিপে ভাত খেতে হল, আর তাজউদ্দিন প্রতি গ্রাসে পিটেলের চোদ্দ-পুরুষের নরকের ব্যবস্থা করতে লাগলো। যত মনো-কষ্ট ঠিক ততটাই আবার আনন্দ, কেমন করে হরিণটাকে মারা হল

তার গল্প, আর পিটেলকে বোকা বানানোর গল্পে ওরা যেন ফেটে পড়তে লাগলো। করিম আলি কথায় কথায় ছড়া কাটে, বললো যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা। বুড়োর সবেতেই এমন বাগড়া দেওয়া অভ্যাস, ছেলে ছোকরারা হেসে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা ছড়া কাটতে লাগলো।

রাত যেন আর কাটতে চায় না! ভোর হতেই তাজউদ্দিনের দল বনে নেমে সর্বপ্রথমে বন্দুকটা পেড়ে আনলো, তারপর গামছা দিয়ে ভাল ভাবে পুঁছতে লাগলো। সারারাত শিশিরে ভিজে বন্দুকটায় জং ধরতে আরম্ভ করেছে। নৌকো ততক্ষণ শিসের মুখে গেরাপি ফেলে অপেক্ষা করছিল। বন্দুকটা পরিষ্কার করে ওরা চললো হরিণ আনতে, গত রাত্রের মারা হরিণ! পিটেলের ভয়ে যাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছিল।

কিন্তু এ-কি! হরিণ গেল কোথায়? ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখে বোবার মত চেয়ে রইলো। যেখানে হরিণ রাখা হয়েছিল, তার তলায় সারারাত চুঁয়ে পড়া এক দলা রক্ত তখনও কালো হয়ে জমে ছিল, কিন্তু হরিণটা গেল কোথায়? ওরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে নিশ্চিন্ত হল যে, বনে কোন নৌকো আসেনি। মানুষ জন কেউই নেই, তবু হরিণ চুরি যায় কেমন করে! বুড়ো করিম আলি সান্ত্বনা দিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনলো নৌকোয়, বললো—চুরি গেছে গেছে, আবার মারতে পারলেই হবে। বনে কি হরিণের অভাব! কিন্তু তাজউদ্দিন এত সহজে দমবার পাত্র নয়, হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললো, মুখের গ্রাস চুরি করা এত সহজ! জবাবে করিম আলি বললো—হ্যাঁ, সহজ। তুই তো কানা, বন্দুক হলেই শিকারী হয় নাকি! পয়সা থাকলে অমন দশ-বিশটা বন্দুক রাইফেল কিনতে পারিস, কিন্তু শিকারী হওয়া অন্য জিনিষ। তোর সে সাধনা কি আছে? দেখিস্‌নি বাঘের থাবার চিহ্ন! সকলে হাঁ হয়ে গেল, সত্যই তো ব্যাপারটা কেউই লক্ষ্য করে নি। তাজউদ্দিনও যেন দমে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই টেনে টেনে বললো, তা হলে শালার ওই বাঘকেই খতম করবো, তখন হরিণ যাবে কোথায়!

দুপুরের আহারের পর তাজউদ্দিন দল-বল নিয়ে আবার যখন বনে নামবার উপক্রম করছিল, করিম আলির তখনও টুকিটাকি কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কাদায় নেমে তাজউদ্দিন বন্দুকে গুলি ভরে সদম্ভে জানালো, বাঘ না মেরে আজ আর ঘরে ফিরবে না। ধমক দিয়ে উঠেছিল করিম আলি, থাম—জঙ্গলে এসে এমন সাপট্ করতে নেই। ওরা সে কথা অগ্রাহ্য করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু করিম আলির মনে তখন 'কু' গাইছে। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো, ওরে থাম, আমি আসছি। দলটা তখন কিছুটা এগিয়ে গেছে, করিম আলির কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তখন তাজউদ্দিন প্রস্রাব করবার জন্য অল্প একটু বনে প্রবেশ করতেই অঘটন ঘটে গেল। বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা বাঘ ওর ঘাড়ের উপর। সেই ধাক্কায় বন্দুকটা ছিটকে পড়লো, কিন্তু তাজউদ্দিনের কি হল কিছু জানার পূর্বেই তীব্র চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল করিম আলি। দা উঁচিয়ে তেড়ে গেল বাঘটার দিকে, ছাড়-ছাড়, ওরে ছেড়ে দে···তার সেই ভয়ানক মূর্তি দেখে দলের লোকজন প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। করিম আলি খিস্তী করে উঠলো, হাঁ করে দেখছিস্ কি! তখন অন্যান্যরাও হৈ-চৈ করে দা উঁচিয়ে ধরলো।

তাজউদ্দিনকে চাপা দিয়ে বাঘটা সামনে গলা খ্যাকারী দিয়ে ওদের ভয় দেখাতে লাগলো, কিন্তু মুখ নীচু করে তাজউদ্দিনকে চার পায়ের ফাঁক থেকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে পারছিল না। যখনই সেই চেষ্টা করেছে বা বারবার উপক্রম করেছে অমনি দলের লোকেরা মাত্র দশ হাত দূর থেকে ভীষণ চিৎকার করে চক্‌চকে দা উঁচিয়ে ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করতে লাগলো। এতে বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে ইতস্ততঃ করছিল। করিম আলি দেখলো—বাঘটাকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখা যাবে না, তখন মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কারে দা-খানা ছুঁড়ে মারলো। এ-তে ফল হল, বাঘটা আচমকা সেই আক্রমণে এক লাফে উঁচু পাড়ে উঠে পড়লো, তারপর ল্যাজ সাপ্‌টে ভীষণ মুখ-ব্যাদন করে গর্জন করে উঠলো। করিম আলি কখনও বন্দুক ছোঁড়েনি, তবু তাজউদ্দিনের

ছিটকে পড়া বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বাগিয়ে ধরলো বাঘকে ভয় দেখাবার জন্য। বাঘটা যেই গর্জন করে উঠলো অমনি ট্রিগারও পড়ে গেল, ভীষণ শব্দ হতেই বাঘটা লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর, এদিকে করিম আলি তখন মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, দলের লোকেরা কিছু বুঝে উঠবার পূর্বেই তাজউদ্দিন চোখ পিট-পিটিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, বন্দুকের ধাক্কায় পড়ে গেলে চাচা! বন্দুক তো আমার ভালই, ধাক্কা একটুও নেই। সকলেই আশ্চর্য হয়ে দেখলো তাজউদ্দিন তখনও বেঁচে, আর সুস্থ মানুষের মত দিব্যি কথা বলে উঠলো! বাঘটা লাফিয়ে পড়তেই তাজউদ্দিন কাদায় পা হড়কে একেবারে ওর পেটের তলায় চলে গিয়েছিল, ফলে কোন চোট লাগেনি, আর বাঘটাও তাই সুযোগ মত কামড়ে ধরতে পারছিল না। এ-হেন অঘটন না ঘটলে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কবল থেকে তার বাঁচার কোন সম্ভাবনা ছিল না। করিম আলির মুখে এক আশ্চর্য সুন্দর বিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো। জবাব দিল এতক্ষণ পরে—না-রে, তোর বন্দুকের ধাক্কায় নয়, ওই শালা বাঘের ভয়েই পড়ে গেছি—শালা যেন সাক্ষাৎ যম! বিড়-বিড় করে বন-বিবির দোয়া মাগতে লাগলো, দেবী প্রসন্ন না হলে কি এমন আশ্চর্য অঘটন ঘটে !

এইভাবে বন তার বিধি-লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেয়, শাসন করে। আর বাঘ—সে যত ভয়ানক হোক, মানুষ সমস্ত শক্তি একত্রিত করে যদি রুখে দাঁড়াতে পারে, তা'হলে তাকে হ'টে যেতেই হবে···।

এই ঘটনার পর আরও দু'বছর কেটে গেছে, সুন্দরবনে অনেক ওয়াড়ী হয়েছে কিন্তু তাজউদ্দিনের আর যাওয়া হয়নি। ঘটনাটা প্রায় সকলেই ভুলে গেছে, কিন্তু ভোলেনি তাজউদ্দিন নিজে। ভোলেনি তার শিকার করা হরিণ চুরির কথা আর বাঘ চাপা পড়ার কথা। যার ফলে ওর ব্যামো দাঁড়িয়ে গেছে, কেমন গা ছম্ ছম্ করে—মাথা ঘোরে আর বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট, যা ও বুঝিয়ে কাউকে বলতে

পারে না। মধ্যে মধ্যে ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে। দুঃস্বপ্নের বাঘ যেন বুকে বসে আছে!

সেদিন কি একটা কাজে গিয়েছিল ধোসার-হাটে, ফেরবার পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বন-বিবির মন্দিরের সামনে। কি ভাবলো, তারপর পুরোহিত ডেকে পূজা করালো ষোড়শপচারে, কি মানৎ করলো—সে কথা কেউ জানলো না।

গ্রামে ফিরে এসে পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে চললো নিরালায় গোপন ষড়যন্ত্র (সলা-পরামর্শ)। তারপর একদিন ভাসিয়ে দিল নৌকো সেই ন-বেঁকির উদ্দেশ্যে। সাঁ সাঁ করে ছুটে চললো নৌকো, যখন পিয়ালী পেরিয়ে যাচ্ছে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। নদীর ধার ফাঁকা হয়ে গেছে। দূর থেকে টিম্-টিমে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছিল, ভেসে আসছিল কুকুরের ডাক। ভাঁটার-টানে দেখতে দেখতে পিয়ালী পেরিয়ে মাতলায় এসে পড়লো নৌকো। হেড়ো-ডাঙ্গায় নৌকো বেঁধে রান্নার পাট চুকিয়ে আবার যখন দাঁড় বাইতে শুরু করলো তখন অনেক রাত।

আবার একটা ভোর হল, গাঙ্গের জলে যেন আবীর গুলে দিয়েছে ভোরের সূর্য। শিসের মধ্যে নৌকো লুকিয়ে রেখে নামাজ সেরে হাঁক পাড়লো সেই করিম আলি, কৈ রে—ও কালু, তাড়াতাড়ি গোছ-গাছ করে নে, আর পান্তা দে। ওরা সকাল-বেলায় পান্তাভাত পিঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে খেয়ে তবে বনে যায়। সারাদিনের ধকল্ সইতে হলে পেটটা ভরা থাকা চাই বৈ-কি! কথাবার্তা এক সময় বন্ধ হয়ে গেল, তখন ওরা গুঁড়ি মেরে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল দিয়ে চলেছে বাতাস কাটিয়ে। হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে দেখলো হরিণ তড়বড় করে ছুটেছে, খুরের চিহ্নগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা। সেই চিহ্ন দেখেই করিম আলি ফিস্-ফিসিয়ে উঠলো, বাঘে হরিণ তাড়িয়েছে। সেই কথা শুনে তাজউদ্দিন থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর বড়-গাছ খুঁজতে লাগলো—জায়গাটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। অনেক টাকা পয়সা খরচ করে বন-বিবির পুজো দিয়ে তবেই এখানে এসেছে।

এই দলে সে-বারে আরও একটা বন্দুক বেড়েছিল, বন্দুকটা নতুন শিকারী মুন্সেফ আলির। দুটো গাছ বেছে নেওয়া হল, একটাতে থাকবে তাজউদ্দিন একা—আর অপরটাতে মুন্সেফকে নিয়ে করিম আলিরা। অগত্যা সেই প্রস্তাব সকলকেই মেনে নিতে হল, কারণ—গোঁয়ার তাজউদ্দিনকে আর ঘাঁটাতে সাহস হল না। নিজের মনে মনেই বললো করিম আলি, এত-তেও ওর হল না, এই জেদের জন্যই মরবে একদিন। কথাটা ওর নিজের কানেই খারাপ লাগলো। বনে এসে এমন কথা না ভাবাই উচিৎ, চুপচাপ বসে রইলো করিম আলি মুন্সেফকে নিয়ে, হরিণ আসবার তখনও সময় হয় নি।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বনে বসে থাকা ভাল নয়, কারণ—মন তখন মনের সঙ্গে কথা বলে, ফয়সালা করে ফলে—সতর্কতা যায় কমে। দৃষ্টির মধ্যে যখন তীক্ষ্ণতা থাকে না, তখনই নিঃশব্দে এগিয়ে আসে বিপদ চুপিসাড়ে পা ফেলে। করিম আলিরও ইচ্ছা নৌকোয় ফিরে যায়, কিন্তু ওই তাজউদ্দিনের জন্য তা সম্ভব হল না। তখন বনের মধ্যে খুট্‌খাট শব্দ শুরু হয়েছে, সূর্যও পশ্চিমাকাশে অনেকটা হেলে গেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতের সন্ধ্যা নেমে আসবে। করিম আলি আশ্চর্য হয়ে দেখলো হরিণ চরতে বেরিয়েছে, কিন্তু নদীর দিকে তখনও আসেনি। ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই হঠাৎ শুনতে পেল—'চাচা' আজ আর কিছু হবে না, নৌকায় ফিরে চল। তাজউদ্দিন কখন গাছতলায় এসে হাজির হয়েছিল কেউ দেখতে পায়নি, সে রাতের মত দলটা নিয়ে গেল নৌকায়।

তার পরের দিন তাজউদ্দিন ওয়াড়ী করতে বেরুল, তবুও কোন হরিণ পাওয়া গেল না। এদিকে মুন্সেফ বন্দুকটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে পায়খানায় বসেছিল বনের ধারে, হঠাৎ নজরে এল একটা হরিণ পাতা খেতে খেতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। হরিণটার সেদিন মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল, গুলি করতেই পড়ে গেল। খুব আনন্দ, মহা ধূম-ধাম পড়ে গেল, নতুন শিকারী মুন্সেফ প্রথমে হরিণ মেরেছে! শিকারী কি অপর শিকারীকে ঈর্ষা করে! করিম আলি দেখলো তাজউদ্দিন

যেন কেমন হয়ে গেছে, মুন্সেফের সাফল্যে ওর কোন আনন্দ নেই! আরও একটা রাত নেমে এল, যতই রাত বাড়তে লাগলো—ততই যেন কি একটা অশুভের-ছায়া নৌকোর ধারে ধারে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সকালে উঠে ওরা দেখলো—খালের চরে বাঘ হেঁটেছে, বুড়ো করিম আলি যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বনে যেতে যেতে হঠাৎ বললো, বনে এসে সাপটু করতে নেই। কেউ কোন জবাব দিল না। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে তাজউদ্দিন কোন কথা না বলে সোজা নিজের গাছে চড়ে বসলো। তখন করিম আলির দল ঘুরে অপর গাছটাতে উঠে বসলো।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন হরিণ এল না, তখন তাজউদ্দিন মতলব করলো হরিণ ওয়াড়ী করবে। বেলা তখন চারটে বেজে গেছে, দলের কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়লো গাছ থেকে; তারপর চললো বন-বাদাড়ে সেই টঁ্যাক লক্ষ্য করে। নির্জন খালের চরে হরিণ ঘাস খেতে আসে। শিকারী বেড়ালের মত গুঁড়ি-মেরে চলেছে বন্দুকটা হাতে নিয়ে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে ওর গা-টা কেমন ছম্-ছম্ করে উঠল, মনে হচ্ছিল—কে যেন আসছে পিছনে পিছনে। তাজউদ্দিন ঘুরে দেখলো, কেউ নেই, কাদার উপর তার নিজের পায়ের ছাপ ছাড়া আর তো কিছুই নেই! যখন টঁ্যাকের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আবার ওই রকম গা ছম্-ছম্ করে উঠলো। তাজউদ্দিন সে-বারও ঘুরে দেখলো-কেউ নেই ওখানে—কেউ যদি আসে, তো সে করিম আলি ছাড়া আর কেউ নয়। এত সাহস আর কারো নেই।

অসম্ভব জেদ ও রেষারেষি নিয়ে বনে হাঁটলে মানুষ তার নিজের মনের বিশ্লেষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির অনেক খুঁটিনাটির খবর নজর এড়িয়ে যায়। এখানে তাজউদ্দিন যদি অভিজ্ঞ শিকারী হত—তা'হলে ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের সেই ইঙ্গিতগুলো ঠিক বুঝতে পেরে সাবধান হতে পারতো। যদি কোন সঙ্গী আনতো, তা

হলেও অনেক নিরাপদ বোধ করতো, কারণ—সঙ্গী পিছন দিকে সময় মত নজর রাখতে পারতো।

এত দুঃসাহস, এত জেদ, এত রেষারেষি সুন্দরবন সহ্য করে না। তাই শেষ বারের মতো আবার যখন তার গা ছম্-ছম্ করে উঠেছিল, তখন বিদ্যুতের বেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বন্দুকটা তুলে ধরেই দেখলো—বেড়ালের মতো জড় হয়ে রয়েছে অতবড় বাঘটা মাত্র দশ-বারো হাত দূরে! বন্দুকের ঘোড়া টানাও সম্ভব হল না, বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘ, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আচমকা শব্দও হল। করিম আলি ও তার দলের লোকেরা সে শব্দ শুনতে পেল, তারপর আবার বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ঝিঁ-ঝিঁরা ডেকে চলেছে। ক্রমে রাত হয়ে গেল তবুও তাজউদ্দিন ফিরে এল না দেখে ওরা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে গাছতলায় পৌঁছে কয়েকবার ওর নাম ধরে ডাকলো, তারপর ফিরে গেল নৌকায়।

তাজউদ্দিনের অপেক্ষায় সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির শেষে যে ভোর হল, তার আলোয় উত্তাপ ছিল না, সেই বিষণ্ণ ভোরে কোন পাখি ডাকেনি, নদীর জল যেন আরও নোনা। ভয়ে, দুর্ভাবনায় আর কান্নায় ওদের রক্তশূন্য, বিবর্ণ মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

করিম আলি পান্তার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল, মনে পড়লো—গত রাত্রে রান্নাই হয়নি, সকালে মাংস খেয়েছে! সঙ্গীদের নিয়ে নেমে পড়লো বনে। পাগলের মতো কিছুক্ষণ চারিদিক হাতড়াল, মা, মা বলে স্মরণ করলো বনবিবিকে—তারপর খালের পাড় ধরে চললো ট্যাঁকের দিকে তাজউদ্দিনের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। ট্যাঁকের কাছাকাছি পৌঁছে দেখে একটা বাঘের থাবার দাগও চলেছে সেই চিহ্ন ধরে! বনের বাঁকটা ঘুরতেই ওদের গলা থেমে গেল, দেখতে পেল কাদার মধ্যে পড়ে রয়েছে বন্দুকটা। আর তার অল্প দূরে চাপ চাপ রক্ত, রক্তের একটা ধারা বয়ে গেছে বনের মধ্যে। গামছাটা জড়িয়ে ছিল একটা ঝোপের গায়ে, সেখানেও রক্ত। করিম আলি ভেবে পেল না তাজউদ্দিনের শরীরে এত রক্ত ছিল!

এই রকম একটা পঙ্গু দল নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করতে করিম আলির সাহস হল না, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন সঙ্গীরা তাজউদ্দিনের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকলো, কান্নামিশ্রিত সেই স্বর বনের অভ্যন্তরে শুধু ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিল কালু আর গামছাখানা হাতে নিয়ে করিম আলি একবার ফুঁপিয়ে উঠলো, তারপর ফেরার পথে পা বাড়ালো। এই ঘটনা বন বিভাগে লিপিবদ্ধ করা হল না, কেন না ওরা বে-পাশী। তবু খালের চরে উড়তে লাগলো তাজউদ্দিনের রক্তমাখা সেই গামছার নিশানা!

এই ঘটনার একমাস পরে ফাল্গুনের শেষে যখন ওদের গ্রামের মৌলীরা মধু কেটে ফিরলো, তখন দলের একজন করিম আলির কাছে এসে বললো, দেখ চাচা, এটা জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছি সেই ট্যাঁকের কাছে। বলে—একটা রূপোর বড় মাদুলী তার হাতে দিল। লোকটা আরও জানালো—বাঘটা পচে ঢোল হয়ে উঠেছে, দুর্গন্ধে সেখানে যায় কার সাধ্যি!

করিম আলির কানে কোন কথাই প্রবেশ করেনি, সে তন্ময় হয়ে দেখছিল রূপোর বড় মাদুলীটা। তাজউদ্দিনের অম্বলের অসুখ ছিল, করিম আলিই তৈরী করে দিয়েছিল এই মাদুলীটা। বিড়বিড় করে শুধু বললো, মরা বাঘ! তা হলে বাঘটাও মরেছে! লোকটা জবাব দিল—হ্যাঁ চাচা, বাঘটা ট্যাঁকের ধারে পচে গলে রয়েছে।

করিম আলি মাদুলীটা অনেক নাড়াচাড়া করলো, তারপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে ছুঁড়ে দিল পুকুরের জলে! টুপ্ করে ডুবে গেল মাদুলীটা, সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপা স্বরে বলে উঠলো, সাবাশ, সাবাশ!

বুড়োর দু'চোখ বেয়ে তখন ধারা নেমেছে, মুখ তুলে বললো, ছাওয়ালটাকে ক্ষমা ঘেন্না করতে পারবো না! —এত নির্মম এত নিষ্ঠুর তোমার শাসন···! চোখের জলে অভিজ্ঞ বাওয়ালীর পাকা দাড়ি ভিজে যেতে লাগলো···!

এক বিগত যৌবনা বাঘিনী এক রাতের আঁধারে চুপিসাড়ে সুন্দর বনের 'আশুথ-বাড়ী'র বনে এসে আস্থানা গেড়েছিল। সাত নম্বর আট নম্বর কামরার পাশ ঘেঁষে যে ফোড়ন খালটা ভাঙ্গাতুথীর গাঙ্গে পড়েছে, সে খালে মানুষ মারার কোন নিশানা এতকাল পোঁতা ছিল না। কিন্তু বাঘিনী আসার পর থেকেই ওই অঞ্চলের সাবেকী নিয়ম-গুলোর আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো, যে সব জেলে কাঠুরে ও মৌলীরা এ বনে এসে অনেকটা নির্ভাবনায় থাকতো, তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। প্রায়ই দেখা যেত দলের কেউ না কেউ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। শত অনুসন্ধান করেও তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যেত না। কেমন করে কোথায় হারিয়ে যেত তার সন্ধান তখনও জানা যায় নি। একটা আতঙ্কে ওদের বুক শুকিয়ে যেত, বাঘিনীর পায়ের ছাপ তখন পর্যন্ত ওদের চোখে পড়েনি।

অদৃশ্য হওয়া লোকগুলোর সন্ধান না পেয়ে, আর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে ওরা ধরে নিল এটা কোন অপদেবতার কাজ! তখন সেই অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য একদিন সকালে বনবিবির পূজো দিতে গেল। মাত্র তিনজন লোক বনের মধ্যে দিয়ে অশ্বত্থ গাছটাকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগলো পূজোর যৎ সামান্য উপচার সংগ্রহ করে। বাদার নোনা মাটিতে অন্য একটা দ্বীপের অশ্বত্থ গাছ আজও আছে। এ বনে বন-বিবির কোন মন্দির নেই এবং এতকাল তার কোন প্রয়োজনও হয়নি। যে বনে কোন মন্দির নেই সেখানে সচরাচর অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষের মূলেই পুজো দেওয়ার রীতি। তিনজন মানুষ যখন সেই অশ্বত্থ গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ওদের কয়েক হাতের মধ্যেই মাটি ফুঁড়ে দাঁড়াল এক বাঘিনী!

বাঘিনীকে দেখামাত্র পুজোর উপচার ফেলে নিদারুণ আতঙ্কে ওরা চিৎকার করতে করতে দৌড়তে লাগলো। পড়ি-কি মরি করে যখন খালের কাদায় নেমে দাঁড়াল তখন ওদের জিভ বেরিয়ে গেছে, আতঙ্কে গলা বুক শুকিয়ে গেছে, চিৎকার করার শক্তিও আর ছিল না,

পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ওরা দুজন তখন কাদার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে সেখানে দেখতে না পেয়ে ধরে নিল তাকে বাঘে নিয়েছে, তবু তার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করলো, —সবই বৃথা।

এরপর বাঘিনী এমন অত্যাচার শুরু করলো, যার ফলে সমুদ্রের কোলে সুন্দর দ্বীপটিতে মানুষ-জনের আসা-যাওয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যারা তড়িঘড়ি করে একবার প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, তারা পারতপক্ষে এ মুখো হত না। দীর্ঘ ঝাউবনের হাহাকার শুনতে শুনতে দাঁড় বাইতো অন্য দ্বীপ লক্ষ্য করে। যে সব হতভাগ্যেরা এ দ্বীপে এসে প্রাণ হারিয়েছিল তাদের মৃতদেহ কোনদিনই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, এমন কি তাদের পরনের কাপড়ের অংশটুকুও নয়। অপদেবতার ভয়ে কেউ বনের গভীরে যেতে সাহস করতো না। নিশানা টাঙ্গানো হতো যে কোন ছেঁড়া গামছা বা কাপড়ের অংশ বেঁধে, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা হারিয়ে যেত কোথায়… !

এতদিন প্রত্যেকটি মৃত্যু ঘটেছে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ও সকলের অজ্ঞাতে। বাঘিনীর খবর তখনও ছিল অজানা। সেবারই বাঘিনী প্রথম আত্ম-প্রকাশ করলো যখন ওরা বন-বিবির পুজো দেওয়ার জন্য আশুথ বাড়ীর বনে গিয়েছিল। অশ্বথ গাছটার জন্যই মাঝিরা এ বনের নাম দিয়েছিল আশুথ বাড়ী। সুতরাং বাঘিনীর অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার পর অলৌকিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল আশুথ বাড়ীর বাঘিনী। যারা ওকে প্রথম দেখেছিল তাদের বর্ণনাতেই এমনটি হয়েছিল। ওরা বলেছিল—রোগা, বীভৎস-বিকৃত চেহারা, লোম ওঠা গায়ে দগ্-দগে ঘা-পুঁজ, কিন্তু মাথাটা এতবড়! বলে দু'হাত বিস্তার করে একটা প্রকাণ্ড ডাইনীর মাথার সঙ্গে তুলনা করতো। তখন দলের লোকেরা স-ভয়ে চোখ বন্ধ করে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বাঘিনীর ভয়ঙ্কর চেহারাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করতো।

শিকারীদের উৎসাহে যখন ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে, তখন কোন

এক শিকারী একবার চেষ্টা করবেন বলে স্থির করলেন। এমন সময় বন-বিভাগ বাৎসরিক হিসাব-পত্র নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল। মানুষ মারা পড়ছে জেনেও শিকারের অনুমোদনপত্র মঞ্জুর করতে দেরী করতে লাগলেন। পরিণামে শিকারীর সঙ্গে কিছু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনুমোদন-পত্র চাপা পড়ে যায়। শিকারী বিনা-অনুমোদনেই বনে যাবেন স্থির করলেন। (শিকারীর নাম এখানে উহ্য থাক।)

পুরো দেড় দিন এক নাগাড়ে দাঁড় বেয়ে যখন খালের ধারে এসে পৌঁছলেন তখন সূর্য সবে অস্ত যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। সূর্যালোকে খালের লোহিত বর্ণের জল ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠলো, নীরব-নিস্তব্ধ বনে সমুদ্রের বাতাস এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পাতায়-পাতায় সংঘর্ষ লেগে যে শব্দ উঠছিল, তাকে ছাপিয়ে ঝাউয়ের কান্না ভেসে এল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এসে আঁধারের পর্দায় সব একাকার করে দিল, নৌকোর ভেঙ্গে পড়া ঢেউয়ের ছল্-ছল্ শব্দে যে অভ্যর্থনা জানানো হল, এক কথায় তাকে বলা যায় অপরূপ, ভয়ঙ্কর সুন্দর! এমন মন কেড়ে নেওয়া জল-জঙ্গল আর কোথাও নেই।

তীর থেকে যথেষ্ট দূরত্বে নোঙর ফেলে স্বাগত জানালেন সুন্দর-বনের প্রথম রাতকে। বাঘিনীর কথা চিন্তা করতে করতে সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করলেন, কোথাও কোন ত্রুটি রাখলেন না। তারপর গুলি ভরা রাইফেলটা কোলের কাছে রেখে খুসী মনে দেখতে লাগলেন বন। সমস্ত এলাকাটা এত নিস্তব্ধ হয়ে গেল যে, মনে হতে লাগলো নৌকোর অস্পষ্ট কথাগুলো পর্যন্ত যেন বনের অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ছে। রাতের রান্না খাওয়ার পাট সকাল সকাল চুকিয়ে প্রহরার ব্যবস্থায় নিজেই বসলেন রাইফেল হাতে। সুন্দরবনে ডাকাতির উপদ্রবও আছে। গভীর রাত্রে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে এসে বাঘিনী নৌকো থেকে ঘুমন্ত মাঁঝিকে তুলে নিয়ে গেছে, অতএব তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হল খালের কালো জলে। কিন্তু সুন্দরবনের রাত যে কত মায়াময় সে কথা চিন্তা করবার অবকাশ রইলো না, দু'চোখের পাতা

ভারি হয়ে নেমে'আসতে চাইলো। তবু শিকারীর চোখে ঘুম নেই, সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে দূরে সরিয়ে রাখলেন ঘুমকে। সারা রাতের মধ্যে একবারও কোন জীবজন্তু ডাকলো না, মনে হয়েছিল—সেই নিঝুম পুরীতে কোন সচল সজীব প্রাণী নেই। এক সময় সেই ক্লান্তিকর রাত জাগার অবসান হল, পূর্বদিকে উষার আলো ফুটে ওঠায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেলেন—একটা হরিণের ঝাঁক গুটি গুটি মিলিয়ে যাচ্ছে।

অনেক বেলায় মাঝিদের সাবধানে থাকতে বলে একজন সঙ্গী নিয়ে সেই কাদা জল ভেঙ্গে বনে উঠলেন। রাতের শিশিরে বনের গাছপালা তখনও ভিজে, পথ চলতে চলতে সপ্ সপ্ করে শব্দ হতে লাগলো। অনেক তল্লাসী চালিয়ে শেষে একটা নালার ধারে মাচা বাঁধলেন, নালাটা অগভীর—ধারণা করলেন বনের প্রাণীরা সেই পথে এ-বন থেকে ওপারের বনে যাতায়াত করে।

বিকাল চারটে থেকে মাচায় পাহারা দেওয়া শুরু হল, সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন উত্তেজনা নেই, কিছুই নেই। তারপর নেমে এল আবার শীতের সন্ধ্যা, চাঁদ উঠতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। একটা বন-শুয়োর চলে গেল, তারপর অনেকদূর থেকে হরিণের ডাক ভেসে এল। বাঘিনীর কোন সাড়া শব্দ নেই, এমন কি তার উপস্থিতি পর্যন্ত কোন জন্তু-জানোয়ার ঘোষণা করলো না।

তৃতীয় দিনে গভীর কাদা ভেঙ্গে ওপারের বনে উঠে যখন বালির রাস্তাটায় হাজির হলেন, তখন পিসু-পোকার কামড়ে কাদা মাখা পা দুটো সূচ ফোটানের মত জ্বালা করতে লাগলো। পিসু-পোকার কামড় অগ্রাহ্য করে সোজা এসে হাজির হলেন সেই বেঁটে অশ্বত্থ-গাছটার কাছে। যাকে আশুথ বাড়ী বলা হত, যেখানে পুজো দিতে গিয়ে একজন মাঝি ওর পেটে গেছে। এ সেই আশুথ বাড়ীর বন! অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রথমেই দেখলেন ঘাস বনটা, ঘাস বন বাঘেদের প্রিয় জায়গা। তারপর গোলপাতার বন, বাঘেরা এখানে দিবা নিদ্রা দেয়। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন অশ্বত্থ গাছটার

কাছে, গাছটাকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়েই স-বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন বাঘিনীর ভুক্তাবশিষ্ট, কয়েক দিনের পুরনো একটা নরমুণ্ড। রৌদ্রের তেজ লেগে কাদা-মাখা মুণ্ডটা শুকিয়ে কালো বীভৎস হয়ে উঠেছে। লম্বা চুলগুলো কাদায় লেপটে রয়েছে মুখের উপর, চোখ দুটো ভিতরে ঢুকে গেছে আর ক্ষত বিক্ষত মুখটা ঈষৎ হাঁ-করা। ক্ষুধার্ত বাঘিনী হতভাগ্যের পুরো দেহটাই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, মাথাটায় এমন কিছু অবশিষ্ট নেই যা বাঘিনীকে আকৃষ্ট করবে। তবুও তিনি মতলব করলেন সেই বেঁটে অশ্বত্থ গাছটায় বাঘিনীর জন্য অপেক্ষা করবেন। সঙ্গীর সাহায্যে কোন রকমে বসা যায় এমন একটা মাচা দ্রুত বেঁধে নৌকোয় ফিরে এলেন অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য।

যথেষ্ট বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে গেলেন মাচায়। বেশ বুঝতে পারছিলেন, মড়ার মাথাটার উপর বাঘিনীর কোন আকর্ষণ না থাকলেও —তার ঘাঁটি আগলে আবার বাঘিনীকে একদিন না একদিন তাঁর রাইফেলের সামনে আসতেই হবে। আর বাঘিনী যদি তাঁকে দূর থেকে দেখে ফেলে, তাহলে নরখাদকের কাছে নিজেকেই টোপ হিসেবে ধরে দেবেন, এ-ছাড়া ধূর্ত বাঘিনীকে গুলির আওতায় আনা অসম্ভব। অনেক সম্ভব আর অসম্ভব চিন্তায় তখন আচ্ছন্ন, দুপুরের সব রোদটাই মাথার উপর দিয়ে গেল। একটা সলুই খালের ধার থেকে অনাবশ্যক উড়ে মাথার উপরের একটা ডালে বসে লম্বা ঠোঁটটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে কি দেখলো, দেখার বস্তুটায় কি ছিল জানা গেল না—পাখিটা হঠাৎ 'ক্যাঁ' করে ডেকেই সেই দিকে উড়ে গেল। বাঘিনীর আস্তানায় এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একটা প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল, এছাড়া আর কোন সাড়া-শব্দ এ-পর্যন্ত হয়নি।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, বনের ওধারে সূর্য নেমে যেতেই গাঙের জল ধীরে ধীরে মসীবর্ণ ধারণ করলো, লম্বা ঘাসের রং বদলে গেল। গোল পাতার বনে এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘন হল যে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না।

রাত এগারোটার পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিতল হরিণের সন্ত্রস্ত ডাক ভেসে এল খালের ওপারের ঝাউবন থেকে। সতর্ক সূচক ডাকটা যেন ক্রমে খালের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো, হয় ওরা বাঘিনীকে দেখতে পেয়েছে, আর না হয় তার গায়ের গন্ধ সতর্ক হরিণদের কাছে পোঁছেছে। গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, এই আশায় যে—বাঘিনী নিশ্চয় খাল পার হয়ে তার আস্থানায় ফিরে আসবে। আর উৎকণ্ঠা রইলো নৌকোর নিরস্ত্র লোকগুলোর জন্য। ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চললো, হঠাৎ খালের ধার থেকে একটা হরিণ বার বার ভয়ার্ত ডাক ডেকে উঠলো, তারপরেই শুনলেন তার স-শব্দে দ্রুত ছুটে যাওয়ার অস্পষ্ট শব্দ। শিকার এগিয়ে আসছে, রাইফেল তুলে নিলেন শিকারী, এমন সময় হুড়মুড় করে কতকগুলো বন-শুয়োর বালির রাস্তাটা ধরে ছুটে গেল। সবই তার উপস্থিতির ইঙ্গিত, শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আবার মৃত্যুর স্তব্ধতা ফিরে এল বনে। অন্ধকার তখন সহ্য হয়ে গেছে, ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে যেটুকু দৃষ্টি চলে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, যদি কোন স্থির বা চলমান ছায়া নজরে আসে। আর মনে মনে আশা করতে লাগলেন, বাঘিনী তার আস্থানায় ফিরে এসে থাবা ছড়িয়ে বসবে, ওৎ পেতে অপেক্ষা করবে কোন অসতর্ক শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু কোন নড়া চড়াই চোখে পড়লো না, চারিদিক নীরব নিস্পন্দ, কেবল নদী থেকে একটা ঠাণ্ডা হাড় শির শির করা হাওয়া এসে সেই অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে থাকা শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে পারে, পাতার আড়াল থেকে কার লোলুপ দৃষ্টি যেন শিকারীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, যদিও এতটুকু ইসারা বা এতটুকু শব্দ সেই নৈশ-স্তব্ধতা ব্যাহত করছিল না। রাইফেলটা শক্ত হাতে ধরে গাছের অন্ধকার তলাটা যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিছুই নেই, তবু

মন বলছে কী যেন এক চক্রান্ত চলেছে সেই ঘোর অন্ধকারের অন্তরালে। বুকের ঢিব্-ঢিব্ শব্দটা তখন নিজের কানেই শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় আচম্বিতে গাছের দো-ডালায় আটকানো পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চটা শব্দ করে মাচার তক্তার উপর পড়লো, তারপর গড়িয়ে গেল নীচে—মাটিতে পড়ার শব্দ হল ঠক্ করে।

ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে রাইফেল সংলগ্ন টর্চের সুইচ টিপে দিলেন। ভেবে-ছিলেন বাঘিনী কখন নিঃশব্দে এসে গাছের প্রথম দো-ডালায় উঠে পড়েছে। এত ভয় পেয়েছিলেন যে, দ্রুত রাইফেল ঘোরাতে গিয়ে গাছের ডালে নল ঠুকে শব্দ পর্যন্ত করে ফেলেছেন। যাইহোক টর্চের আলোয় দেখলেন, বাঘিনী নেই, শুধু নিকেল করা টর্চটা চক্-চক্ করছে! হৃদস্পন্দন তখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, কোথাও বাঘিনীর চোখ জ্বলে উঠলো না।

আলো নিভিয়ে দিয়ে হটকারিতার জন্য নিজেকে শাপান্ত করলেন, নিজের গোপনে অবস্থানটা মারাত্মকভাবে প্রকাশ করে ফেল্লার দরুন নরখাদকের জঙ্গলে অনুচ্চ মাচায় এ এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। বাঘিনী হয় গাছের গোড়ায় গা ঘষেছে, আর না হয় থাবা তুলে মাচায় ওঠবার চেষ্টা করছিল। আচমকা টর্চটা পড়ে যেতেই ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে গেছে! সেই মুহূর্তে করবার আর কিছুই ছিল না, শুধু সতর্ক হয়ে বাকি রাতটুকু জেগে থাকা। তারপর বাকি রাতটা সত্যিই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কেটে গেল। সূর্যোদয়ের পর খুব মন দিয়ে বন দেখলেন, একটা ভীষণ উত্তেজনা তোলপাড় করছিল—গাছ থেকে নামলেই বাঘিনী ভয়ঙ্কর গর্জন করে তেড়ে আসতে পারে, কিন্তু কিছুই হল না। মাঝিরা বললো—কাল রাত্রে খালের ধারে যে-ভাবে হরিণ ডাকছিল, তা-তে মনে হয়েছিল বাঘিনী হয়তো সোজা এসে নৌকোতেই চড়ে বসবে!

বেলা দুটোর পর আবার জলের বোতল, শুকনো খাবার ও রাইফেলটা নিয়ে রওনা দিলেন। পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চটা গত রাত্রে

নীচে পড়ে গিয়েছিল, সকালে ফেরার সময় তুলে আনতে গিয়েছিলেন। এখন দেখলেন সেটা কাদায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে, বাঘিনী কোন ফাঁকে এসে কৌতূহল মিটিয়ে গেছে কে জানে! টর্চটা পরিষ্কার করে মাচায় চড়ে বসলেন, আবার শুরু হয়ে গেল সেই এক ঘেঁয়ে ক্লান্তিকর প্রহরা। মধ্য দিনের প্রচণ্ড রোদে খুবই অসুবিধা হতে লাগলো, রোদ ঝল্‌সান সবুজ ঝোপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় চোখে জ্বালা ধরে গেল, আর ঠিক সেই সময় ঘুমে ঢুলতে লাগলেন।

বাঁ-দিকের গোল-পাতার বনে হঠাৎ যেন দেখতে পেলেন, কি সরে গেল—হয়তো সাপ। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা ছুটে গেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত গাছের একটা পাতাও আর নড়লো না। এইভাবে নিস্ফল প্রহর গুনতে গুনতে অস্থির হয়ে চিন্তা শুরু করে দিলেন, বাঘিনীর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে পিছনের নিবিড় বনে প্রবেশ করবেন কি না! কিন্তু এই ঘন দুর্ভেদ্য বনে কোথায় তাকে খুঁজে বার করবেন! শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন—ধূর্ত বাঘিনীকে বধ করতে হলে তাকে যেমন করেই হোক অনুসরণ করতেই হবে। বর্তমানে বাঘিনী তাঁর মাচা দেখে ফেলেছে, এখন দেখা যাক্ এ রাত্রে বাঘিনী কি করে।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা, এমন কি গভীর রাত পর্যন্ত সেই একই ভাবে বসে রইলেন, জঙ্গলেরও সেই এক রূপ, একই চেহারা—একই শব্দের পুনরাবৃত্তি। অদ্ভুত শান্ত ও স্তব্ধ, মাঝে মাঝে কেবল শোনা যাচ্ছিল শুয়োরের ছোটাছুটির অস্পষ্ট হাল্কা পায়ের মৃদু আওয়াজ, আর দূর থেকে ভেসে আসা চিতল হরিণের ডাক। রাত আড়াইটে কিম্বা তিনটে নাগাদ নদী থেকে হঠাৎ হাওয়া উঠলো, ঘন অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে আছে। অল্প অল্প শীত অনুভব করায় মোটা চাদরটা অত্যন্ত সন্তর্পণে পিঠে চাপা দিলেন, সিগারেট খাওয়ার প্রচণ্ড ঝোঁকটা মাথা চাড়া দিয়েছে, কিন্তু মনটাকে কিছুতেই স্থির করতে পারছিলেন না।

আধ ঘণ্টাও হয়নি হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খস্‌খসানির শব্দ কানে

এল। মনে হচ্ছিল—ঘাসবন থেকে গোলপাতার ঝাড়, আর গোল-পাতার ঝাড় থেকে ঘাসবন পর্যন্ত বনের আড়ালে কে যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে পায়চারী করছে। রাইফেলটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে কান পেতে সেই শব্দটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। ঘন ঝোপের নীচে আকাশের আলো এতটুকুও পৌঁছল না, নিরেট অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখলেন উষার আলো ফুটে উঠেছে, সূর্যোদয়ের তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। সেই অনড় এক ঘণ্টাও শেষ পর্যন্ত কেটে গেল, কিছুই নজরে এল না। বাঘিনী এসেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলেন আরও একটা রাত তাঁকে এখানে কাটাতে হবে, বাঘিনী শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঝুঁকি একটা নেবেই নেবে। পরিণাম যত ভয়ঙ্করই হোক্ শিকারীকে তার মোকাবেলা করতেই হবে, এই দুঃসাহসের জন্যই হয়তো শিকারীরা আর পাঁচজন থেকে ভিন্ন। সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াতে লাগলেন, তবু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না—সুন্দরবনের জল-জঙ্গল এমনিই, এখানে নিশ্চিত বলে কিছু নেই।

পরের দিন একটু দেরী করেই রওনা দিলেন, বিকাল চারটের পর যথাস্থানে এসে হাজির হলেন, শুরু হয়ে গেল চতুর্থ রাতের প্রহরা। কিছু নেই, তবু কিছু ঘটতে তো এক সেকেণ্ড সময়ও লাগবে না! প্রতিটি সেকেণ্ডের হুঁশিয়ারী নিয়ে অবিচল হয়ে রইলেন শিকারী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত ঘন হচ্ছিল। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

রাত তিনটের পর ঝির-ঝিরে হাওয়া শুরু হল, অন্ধকারও যেন ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এল। এ রাতটাও ব্যর্থ হল ভেবে যেই একটু পাশ ফিরে বসবেন অমনি দেখতে পেলেন ধূসর রঙের একটা মস্ত মাথা মাচার কয়েক গজ নীচে উঁচু হয়ে রয়েছে। বড় বড় চোখ দুটো সেই স্বল্প আলোতেই যেন ঝক্ ঝক্ করছিল! ক্ষুধার্ত বাঘিনীটা শেষ পর্যন্ত গাছের গোড়ায় থাবা তুলে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রের মত রাইফেলের নল নীচু করলেন, এত ধীরে ধীরে রাইফেলটা ঘোরালেন যে, সেটা

নড়ছে বলে বোঝা যায় না। উত্তেজনাটা দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছেন, আর এক সেকেণ্ড! টর্চের সুইচটা টিপে দিতেই চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চেপে দিলেন রাইফেলের ট্রিগার। প্রচণ্ড শব্দের শেষে দেখলেন ধোঁয়া! টর্চের আলোয় ধোঁয়াটা যেন জড়িয়ে রয়েছে। শীতের রাত্রে যখন কুয়াশা মাটিতে নেমে আসে তখন এই রকম হয়, টর্চের আলো কুয়াশা ভেদ করতে পারে না, বরং প্রতিহত হয়ে বিপরীত দিকেই ফিরে আসে।

একটা মানুষখেকো বাঘকে গুলি করবার পর যদি সেই অবস্থা আসে, তখন শিকারীর করণীয় কি! যতই গুলি ছুঁড়বেন ততই ধোঁয়া আর কুয়াশায় দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে। অথচ গুলি না করেই বা স্থির থাকবেন কেমন করে, আপনি জানেন না—আহত জানোয়ারটা তখন কি করছে। ধোঁয়ার আড়ালে এমন কি তার এগিয়ে আসা পর্য্যন্ত চোখে পড়বে না। এ অবস্থাটা খুবই মারাত্মক! তিন হাত দূরের জানোয়ারটার গতিবিধি পর্যন্ত বোঝা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাই হল, ধোঁয়ায় দৃষ্টি শক্তি ব্যাহত হল, আর সেই সুযোগে আহত বাঘিনী একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঘাস বনটা তছনছ করে ছুটে গেল। আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বাঘিনী লাফ দিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা যে করেনি, সেইটুকুই শিকারীর ভাগ্য! যদি করতো, তা'হলে মাত্র আট নয় হাতের উচ্চতা অতিক্রম করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়, শিকারীকে নিশ্চয় পেড়ে ফেলতো মাটিতে। এইভাবে প্রথম সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল বাঘিনী, জানা গেল না কতটা সে আহত হয়েছে।

আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল, ফিরে এল অরণ্যের স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। শিকারী তখনও নিজেকে ধাতস্থ করতে পারেন নি, এত সতর্ক থাকা সত্বেও কেমন করে বাঘিনী নিঃশব্দে এসে গাছের গোড়ায় পা তুলে দাঁড়াল! যে ঘাস-বনটা ফুঁড়ে বাঘিনী উন্মাদিনীর মত ছুটে গেছে, সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না সকাল হল। ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল ঘটনার গুরুত্ব, এবং আগামী কাল সূর্যোদয়ের পর তাঁকে কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা

করতে হবে! গুলিটা মগজে প্রবেশ করলে বাঘিনী গাছ তলাতেই মরে পড়ে থাকতো, তাহলে গুলিটা লাগলো কোথায়! ফস্‌কে যায়নি তো! আহত বাঘিনীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন কতক্ষণ, তারপর নেমে পড়লেন মাচা থেকে।

রাইফেলের আওয়াজ ও সেই সঙ্গে বাঘিনীর গর্জন শুনে নৌকোর সঙ্গীরা উত্তেজনায় আর স্থির থাকতে পারেনি। খালের এ পারের বাদায় দাঁড়িয়েছিল, শিকারীকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলো, বাঘিনী মারা পড়েছে কি-না! শিকারী ওদের কাছে ফিরে এসে গত রাত্রের ঘটনা শোনালেন। তারপর আরও বললেন, এবার তাদের করণীয় কি! বাঘিনীকে খুঁজে বার করতে হলে কি ঝুঁকি নিতে হবে তার বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বেলা বারোটার সময় আবার ফিরে এলেন মাচার তলায়। এবার সঙ্গে তিন চার জন উৎসাহী সঙ্গী রয়েছে, ওরা দা হাতে নিয়ে শিকারীকে সাহায্য করতে এসেছে জঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য। একটা গাছের সবথেকে উঁচু ডালে একজনকে তুলে দিয়ে দেখতে বললেন, যদি কিছু দেখা যায়! লোকটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে জানিয়ে দিল, বাঘিনীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মাচার নীচে প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে ছিল।

আহত বাঘিনীকে অনুসরণ করবার জন্য শিকারী দাঁড়াল ঘাস-বনটার একটা ধারে। তার সঙ্গীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পাঠিয়ে দিলেন খালের ফাঁকা দিকটায়। এইভাবে ঘাস-বনটাকে বেড় দিয়ে ধীরে ধীরে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে অগ্রসর হতে লাগলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে মেপে চলতে লাগলেন। গুলি খাওয়া বাঘিনী কোথাও আঘাতের যন্ত্রণায় শুয়ে রয়েছে, তার কোন খবরই আক্রমণের পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানা যাবে না। বনের একটা ফড়িং কিম্বা কোন পোকামাকড় সামান্য একটু নড়াচড়া করলেই উন্মুখ হয়ে রাইফেল বাগিয়ে ধরেছেন, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গীদের উপরও কড়া নজর

রাখতে হয়েছিল, বাঘিনী আক্রমণ করে বসলে পাছে ওরা আলাদা হয়ে দল ছাড়া না হয়ে পড়ে বা লাইন-চ্যুত হয়ে যায়! হঠাৎ দেখলেন একটা সাপ চলে যাচ্ছে, তার পরেই লক্ষ্য পড়লো একটা 'টি-টি-হট্' লম্বা পা ফেলে ঘাস-বন থেকে বেরিয়ে গেল। টি-টি-হটকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটতে দেখে ধরে নিলেন বাঘিনী ঘাস-বন থেকে অন্য কোন জায়গায় চলে গেছে।

সেফ্‌টি খোলা রাইফেল হাতে, আর বুক সমান উঁচু ঘাস-বন ঠেলে ঠেলে অগ্রসর হতে হচ্ছিল, আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা—এই বুঝি বাঘিনী তার গুপ্তস্থান থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুখ বেয়ে সেই শীতের দিনেও ঘাম গড়াতে লাগলো। নিরস্ত্র সঙ্গীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, ক্ষ্যাপা বাঘিনী তখন কি করবে না করবে তা ধারণাতীত। অবস্থা তখন এতই সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল যে কেতাবে তার কোন ব্যাখ্যা নেই। ক্রমে চতুর্দিকেই তিনি বাঘিনীর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলেন। এ অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক চিন্তা করে ফিরে এলেন ঘাস-বন থেকে।

তারপর হাঁটা দিলেন বালির রাস্তাটা ধরে সোজা সমুদ্রের তীর লক্ষ্য করে। সেখানে পৌঁছে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলেন, পিছনের ঘন বনটায় যাওয়ার কোন পথ আছে কিনা। সঙ্গীরা জানালো আছে, তবে খুবই কষ্টদায়ক। তখন কোন কষ্টকেই আর কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না, যেমন করেই হোক বাঘিনীকে খুঁজে বার করতেই হবে—আর শেষ গুলিটা ছুঁড়ে ওর যন্ত্রণারও লাঘব করতে হবে। সঙ্গীরা রাজী হয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলো, বাঘিনীকে পিছনের জঙ্গলেই পাওয়া যাবে এবং ওরা পিছন পর্যন্ত খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে।

তখন সমুদ্রের তীর ধরে উঁচু পাড়টার উপর গিয়ে পড়লেন। কাঁটায় ভরা দুর্ভেদ্য বনে প্রবেশ করতেই হাত পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেল। রক্তও পড়তে লাগলো। সমস্যায় পড়ে গেলেন যখন কাদায় ভরা নালা এসে পথ রোধ করতে লাগলো। অযথা অনেক হাঁটা-হাঁটি করে কাদায় মাখামাখি হয়ে অশেষ দুর্দশা ভোগ করে যখন নালা

পার হলেন, তখন দম্ ফুরিয়ে গেছে। ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে, তারপর আবার একটা নালা, নয়তো দুর্ভেদ্য এক কাঁটা ঝোপ। সমস্যা আর সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যখন পাগল হওয়ার মত অবস্থা হয়েছে, তখন হোঁচট্ খেয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। এমন সময়ই দেখলেন, বাঘিনীর পায়ের টাটকা দাগ। বাঘিনী কিছুক্ষণ পূর্বে স্থান ত্যাগ করেছে, হয়তো ওদের এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। বাঘিনী যেখানে শুয়েছিল পরীক্ষা করে দেখলেন জায়গাটা তখনও দেহের তাপে ঈষৎ উষ্ণ ছিল, তখনও বাঘিনীর জখম থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। এক দলা রক্ত-বমিও নজরে পড়লো। সেটা পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলেন, গুলিটা ওর মুখে লেগেছে। চোয়াল ভেঙ্গে একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাই এত রক্ত, আর সেই তাড়সে প্রচণ্ড জ্বরে প্রায় বেহুঁস।

বাঘিনীর থাবার দাগ এলোমেলো ভাবে বনটাকে ঘুরে সেই গোলপাতার বনে গিয়ে ঢুকেছে। তখন খুব তাড়াতাড়ি বন থেকে বেরিয়ে সেই গোলপাতার বনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন ওদের চেনবার জো ছিল না। সে যাই হোক—বাঘিনীর সন্ধান পাওয়ার পর উৎসাহ যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছিল। সঙ্গীরা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো, ঐ তো বাঘিনী! গোলপাতার বনে ঢুকে গেছে।

গোলপাতার বন থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে শিকারী উদ্যত রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর সঙ্গীরা কাদার তাল পাকিয়ে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। বাঘিনী কিন্তু টুঁ শব্দটাও করলো না, এমন কি সেই বনে আত্মগোপন করে রয়েছে, তারও আভাষ পাওয়া গেল না। এমন সময় একজন সঙ্গী সাহস করে অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে মাটিতে ঝুঁকে বনের তলাটা দেখতে গেল। লোকটা দু'হাতে ভর করে মাটিতে ঝুঁকেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, বাঘিনী! বাঁ দিকের বড় গোল গাছটা দেখিয়ে বললো, বাঘিনী ওর তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেই কথা শুনে শিকারী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাটিতে ঝুঁকে

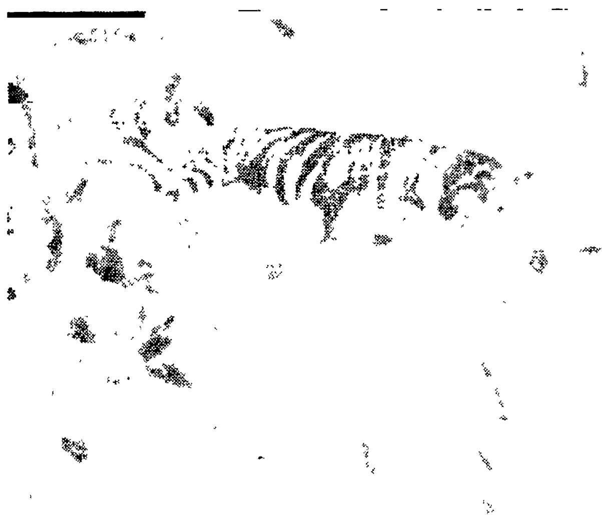
কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন পুরো দলটাই এগিয়ে এল, আর পূর্বের সেই লোকটি আবার চেষ্টা করেও বাঘিনীকে আর দেখতে পেল না। তখন পুরোদমে আবার কাদার তাল ছোঁড়া শুরু হল, শিকারী রাইফেল হাতে তৈরী হয়ে রইলেন। এমন সময় আবার দেখা গেল দুটো পা পাশাপাশি জড় হয়ে রয়েছে। এবার আর ভুল হল না, শিকারীও দেখলেন মোটা মোটা পা দুটোকে। পা দুটো সামনের। অতএব দেহটা আন্দাজ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। এ দিকে বাঘিনীরও ফাঁকায় বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বাঘিনী বিরক্ত হয়ে আরও ঘন জায়গায় সরে যেতে পারে, ভেবে শিকারী আন্দাজে নিশানা ঠিক করলেন, তারপর টিপে দিলেন ট্রিগার। উদ্দেশ্য, গুলিটা ঠিক জায়গায় না লাগলেও বাঘিনী তেড়ে আসবে, আর সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন।

শিকারীর সে আশা পূর্ণ হল না। রাইফেলের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো বাঘিনী, তারপর গোলপাতার বনটাকে যেন ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। ঘূর্ণী ঝড়ে যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকম ভাবে তছনছ হয়ে গেল গোলপাতার বন, তবু বাঘিনী ফাঁকায় বেরিয়ে এল না। আক্রমণ করবার জন্য তেড়েও এল না। বাঘিনী যখন আবার স্থির হল, তখনই স্তব্ধ হল গোলপাতার বনের সেই প্রচণ্ড আলোড়ন। ততক্ষণে বাঘিনীর পা দুটো আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন শিকারীর দল বনটাকে বেড় দিয়ে অশ্বত্থ গাছটার বিপরীত দিকে গিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেলেন, বাঘিনী মাটিতে লম্বা হয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলেন, গুলিটা ঠিক জায়গায় লেগেছে আর বাঘিনী মরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই ধারণা বদলাতে হল, বাঘিনীর পেটটা মৃদু ওঠা নামা করছিল। এরপর শুনতে পেলেন খড়-খড় শব্দ।

তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে গেছে, দিনের আলো ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। তবুও সেই স্বল্পালোকে বাঘিনীকে

আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তার পিঠটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন। ভালো ভাবে নিশানা নিয়ে পিঠের শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিলেন, বাঘিনী আর নড়লো না।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আশুথ বাড়ীর বাঘিনী মারা পড়লো। শিকারী তখন আপন মনে সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চলেছেন। মাঝিরা নৌকায় ফিরে গেল লোকজন ও দড়িদড়া আনবার জন্য, বনে তখন কোন ভয় নেই, শিকারী নির্বিঘ্ন মনে ধূম-পান করে চলেছেন।



বাঘিনীকে বেশ করে বাঁশ পেটা করে তবেই বন থেকে টেনে বার করলো মাঝিরা। রোগা লম্বাটে বুড়ী বাঘিনী, চোখ দুটো অসম্ভব পিচুটীতে ভর্তি। শরীরের অনেক জায়গায় লোম উঠে গিয়ে দগদগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছিল, দুর্গন্ধে মাঝিরা থু থু করে থুথু ফেলতে লাগলো। গোলপাতার বনে ওর নিজের বাড়িতে অনেক পুরনো হাড় গোড়ের মধ্যে এইভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল আশুথ বাড়ীর বাঘিনী··· !

প্রথম গুলিটা লেগেছিল মুখে, যার ফলে ওর উপরের চোয়াল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাওয়ায় ও জ্বরে যন্ত্রণায় এত কাবু হয়ে পড়েছিল।

আর—দ্বিতীয় গুলিটা যেটা আন্দাজ করে ছোঁড়া হয়েছিল, সেটা শরীরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিঁধেছিল—ডানদিকের পাঁজরায়। তৃতীয় বা শেষ গুলিটার আওয়াজ বোধহয় আর শুনতে পায়নি, যেটা শিরদাঁড়া ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল।

বাঘিনীকে তুলে আনবার সময় তার ভুক্তাবশিষ্ট—যে বীভৎস নরমুণ্ডটা কাদায় পড়েছিল, সেটাকেও সঙ্গে এনেছিল মাঝিরা। মাথাটা হিন্দুর না মুসলমানের তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই যথাবিহিত শাস্ত্রমতে পারলৌকিক ক্রিয়া করা সম্ভবপর না হওয়ায় মাঝিরা সেই অজানা হতভাগ্যের অবশিষ্ট স-শ্রদ্ধায় ভাসিয়ে দিয়েছিল সমুদ্রের জোয়ারে··· !

ঝড়খালির সুধীর জানার সঙ্গে আমার দৈবাৎ আলাপ হয়েছিল। সেদিন আলিপুর কোর্টে গিয়েছিলুম মণ্টুর (সুনীল রায়) সঙ্গে দেখা করতে। মণ্টু তখন চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট হাণ্টার, খোঁজ খবর করে জানতে পারলুম ছুটি নিয়ে সে দেশের বাড়ী ঝাড়গ্রামে গেছে। অগত্যা গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্যে কোর্ট প্রাঙ্গণে একটা চায়ের ষ্টলে বসলুম। সুধীর জানা আমার পাশেই বসেছিল, কথায় কথায় ওর সঙ্গে আলাপ হল। যখন সে জানতে পারলো আমি একজন শিকারী এবং সুন্দরবনে আমার যাতায়াত আছে, তখন বললো, আসুন না একদিন আমার ওখানে, নৌকো করে আপনাকে জঙ্গলে ঘোরাবো।

সুধীর জানা একজন উদ্বাস্তু, জীবিকা মাছ ধরা এবং ওর নিজস্ব নৌকো আছে। এই তিনটে খবর আমার কাছে অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলুম।

তারপর ওর নির্দেশমত একদিন ক্যানিং হয়ে ঝড়খালিতে এসে পৌঁছলুম। গ্রামের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। গ্রামটা কেমন থমথমে বলে মনে হল, লোকজনের দৃষ্টিও সেইরকম। কেমন যেন সন্দিগ্ধ ভাব। বিশেষ করে আমার রাইফেলটার ওপরই যেন সকলের নজর আটকে রয়েছে, যে লোকটা

আমার ছোট বেডিং ও ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে কিন্তু নির্বিকার।
যাইহোক, সুধীর জানার বাড়ীতে তো এসে পৌঁছলুম, ভেবেছিলুম সুধীর জানা আহ্লাদে নেচে উঠবে। সুধীর জানা দরজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো, তার মুখ কেমন বিষণ্ণ দেখে মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগলো। যে আনন্দ নিয়ে এসেছিলুম তা যেন কোথায় উবে গেল, পথের আলাপের ওপর নির্ভর করে এমন করে চলে আসা বোকামী হয়েছে। অবশ্য এমন বোকামী আমি জীবন ভোর অনেক করেছি, তাই মনকে বোঝালুম—ধীরে, বন্ধু ধীরে।

চা খেতে খেতে সুধীর জানা বললো, আজ ভোরে ওদের গ্রাম থেকে একদল মাছ ধরতে গিয়েছিল, খালে জাল ফেলবার সময় একজনকে বাঘে ধরেছে। দলটা ফিরে আসতেই খবরটা চতুর্দিকে রটে গেছে। বে-পাশীর দল তো, তাই খবরটা সকলেই চেপে যাবার চেষ্টা করছে—থানা-পুলিশ বা বন-বিভাগের কানে যেন খবরটা না যায়। সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে আছে। জেলে প্রধান গ্রাম, সকলেই খাল বিলের ওপর নির্ভর করে—এদের একতা খুব। তাছাড়া পাশ যোগাড়ের ঝঞ্ঝাট অনেক, খুব বড় দল না-হলে সচরাচর কেউ ও-পথে পা বাড়ায় না। ধরা পড়লে পিটেল্‌রা জাল কেড়ে নেয়, জরিমানা করে, কখন সখন ধমক ধামক দিয়ে আবার ছেড়েও দেয়। এসব ওদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

এরপর অনেকেই সুধীর জানাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপন পরামর্শ করে গেল। সুধীর জানা বললো, ঠিক এই সময় আপনি এসে পড়ে খুব ভাল করেছেন। আপনার রাইফেল দেখে এখন অনেকেই সাহস পাচ্ছে, কাল ভোরবেলা রওনা দেব—তৈরী থাকবেন।

ভোরবেলা তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, নৌকোয় এসে বসলুম। চারজন দাঁড়ী, একজন মাঝি, আমি, সুধীর জানা ও আরও দু'জন অবস্থাপন্ন ঘরের লোক—তাদের হাতে বন্দুক। নোঙ্গর তুলে নিঃশব্দে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল—অনেকেই জোড় হাত কপালে

ঠেকিয়ে নমস্কার করলো, কেউ কেউ তীরের মাটি স্পর্শ করে মাথায় বুকে বুলিয়ে নৌকোর গলুইতে সেই হাত সন্তর্পণে রাখলো। ছুপ্ ছুপ্ করে দাঁড় পড়তে লাগলো, কোণাকুণি নদী পার হয়ে পীরখালে যখন নৌকো প্রবেশ করলো তখন সূর্য উঠে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে একটা বাঁকের মুখে এসে নৌকো থামলো।

খালের ধারের ঘন ঝোপ পেরিয়ে একটা মাঠের ওপর এসে পৌঁছলুম। মাঠটায় কোমর খানেক উঁচু নল খাগড়ার বন, তার চতুর্দিকে বড় গাছের জঙ্গল। যে হাল বাইছিল—সেই মাঝি হচ্ছে পরাণ বাওয়ালী। সেই বাওয়ালী কাঁধের গামছাটা পাকিয়ে মাথায় জড়াল, তারপর বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তার হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে মনে মনে মন্ত্র পড়ছে। মন্ত্রই পড়ুক আর বনের ভাবই বুঝুক, ডান হাতে দা-টা শক্ত করে চেপে ধরলো। মনের মতো বনেরও ভাব আছে, সেই ভাব কখন গরম, কখন নরম। বনে পা দিয়েই বাওয়ালীরা বুঝতে পারে—বন নরম না গরম। সুধীর জানা অনেক দূরের একটা ঝাঁকালো ক্যাওড়া গাছ দেখিয়ে বললো, বাঘটা মৃতদেহ মুখে নিয়ে ওই দিকে গেছে। বাওয়ালী একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল, তেমনি ভাবেই ডান কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল, তারপর মুখ তুলে আকাশ দেখলো। আকাশ দেখে নজর নামিয়ে আনলো পায়ের গোড়ায় মাটির ওপর, তারপর সোজা চলতে আরম্ভ করলো। আমরাও গুলিভরা বন্দুক রাইফেল নিয়ে বাওয়ালীর পিছু নিলাম।

অনেক মড়ি দেখা থাকলেও আমি কখনও মৃতদেহ উদ্ধারে যাইনি। বাওয়ালীর পিছু পিছু যেতে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলুম। ঘাস বনটা পেরিয়ে বড় গাছের জঙ্গলে প্রবেশ করতেই বাওয়ালী বললো, কথা বলবেন না। যদিও কথা বলা অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই গাছের ডাল ঝাঁকানোর শব্দ হল। মুখ তুলেই দেখি একটা বানর গাছের ডালে বসে কিচকিচ করে খুব মৃদু স্বরে ডাকছে। বাওয়ালী তার দিকে হাত বাড়িয়ে শিস্ দিতেই

বানরটা এ-ডাল ও-ডাল করে বনের মধ্যে চলে গেল। বানরটাকে দেখে মনে হল—সে বড় নিঃসঙ্গ, বড় বিমর্ষ, কিন্তু বাওয়ালী তার তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বানরটা অদৃশ্য হতেই বাওয়ালী গুঁড়ি মারতে আরম্ভ করলো, আমার মনে হল বানরটা যেন কোন ঈশারা করে গেল বাওয়ালীকে।

বড় জঙ্গলটার শেষ মাথায় সেই ঝাঁকালো ক্যাওড়া গাছ, বাঘটা মৃতদেহ মুখে নিয়ে এই দিকে এসেছিল। ক্যাওড়া গাছটা পার হতেই আবার খানিকটা মাঠ মতন চোখে পড়লো, এখানেও বড় বড় ঘাস গজিয়েছে—তবে তার মধ্যে ছোট ছোট গাছও রয়েছে প্রচুর। মাঠের ও-প্রান্তে আবার বন। হঠাৎ সেই বনের মাথায় গাছের একটা ডাল নড়ে উঠলো। সেই 'নড়া' দেখে প্রথমেই মনে হল সেই বানরটাই ডাল নাড়াচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাওয়ালী আমাদের ইঙ্গিত করেই মাটিতে বসে পড়েছে। বাওয়ালীর মত আমারও ধারণা হল মৃতদেহ ওখানেই রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, বাঘটাও সেখানে আছে কিনা!

বাওয়ালী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো, বাঘ মারতে চান? আমি সুধীর জানার দিকে তাকালাম, বন্দুকধারীরা বললো—আমরা তো মড়ি উদ্ধার করতে এসেছি, সেই সঙ্গে যদি বাঘ মারতে পারি মন্দ কি, বলে আমার দিকে তাকালো। বাওয়ালী বললো, তাহলে আমার একটা পরামর্শ নিন। বাঘ ওখানে আছেই এমন কথা জোর করে অবশ্য বলা যায় না, তবু ধরে নিন বাঘ ওখানে আছে। এখন সেই বাঘকে মারতে হলে কি কৌশল করা উচিত! আমি বলি কি, আপনারা দু'দলে ভাগ হয়ে যান। একদল ঘুরে পিছন দিকটায় ঘাঁটি করুন, আর একদল এখান থেকে বরাবর সোজা এগিয়ে যান।

আমি বাওয়ালীর মতলবটা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম। ও চাইছে —যে দল এখান থেকে সরাসরি সামনে যাবে তাদের গুলি খেয়ে কিম্বা দেখতে পেয়ে বাঘ যদি পিছনে ঘন জঙ্গলে পালাতে চেষ্টা করে এবং করবেই, কারণ বাঘ তাড়া খেলেই ফাঁকায় না এসে সাধারণত

গভীরাঞ্চলের দিকেই ছোটে। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দল গুলি করার একটা ভালমত সুযোগ পাবে। বাওয়ালীর পরামর্শ সকলেই মেনে নিল। আমি দেখলুম বন্দুকধারীরা পিছনের জঙ্গলে গিয়ে ঘাঁটি করতে চায় এবং বাওয়ালী অতি অবশ্যই ওদের সঙ্গে থাকবে, আর এদিকে সুধীর জানা ভাল মত গুঁড়ি দিতে পারে না, সেটা একটা মস্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব আমি প্রস্তাব দিলুম এখান থেকে সরাসরি আমি একা যাবো। সুধীর জানা বাধা দেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু বাওয়ালী যখন বললো, ঠিক আছে উনি একাই যাবেন—রাইফেল রয়েছে চিন্তার কোন কারণ নেই। রওনা হওয়ার পূর্বে আমি জিজ্ঞাসা করলুম পিছনের জঙ্গলে পৌঁছতে ওদের কত সময় লাগবে? বাওয়ালী বললো—আধঘণ্টা, আপনি আধঘণ্টা পরে গুঁড়ি মারা শুরু করবেন।

ওরা একটা নালায় নেমে জঙ্গলের পিছন দিকে চলে গেল। আমি বসে বসে সমস্ত বনটাকে বারবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম। এতক্ষণ আমরা পাঁচজন ছিলুম, এখন আমি একা এবং দুশো গজ দূরে মড়িটা পড়ে আছে, আর হয়তো বাঘটা এখনও খাচ্ছে—নয়তো পাশে বসে থাবা চাটছে।

সুন্দরবন সম্বন্ধে তখনো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারিনি, মাত্র কয়েকবার এসেছি। সেই ১৯৪০ সাল থেকে আমি রাইফেল ছুঁড়ছি—প্রথমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তারপরে শিকারের জঙ্গলে। উড়িষ্যার জঙ্গলেই আমি বেশি শিকার করেছি, আর শেষ বয়সে এসেছি সুন্দরবনে। সুন্দরবন ছেড়ে আর কোন জঙ্গলে যেতে ইচ্ছা করে না, এ এমনই এক জঙ্গল! ক্রমে সুন্দরবনের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল। এই পীরখাল—যেখানে আমি এখন বসে আছি, আধঘণ্টা সময় অপেক্ষা করছি, সেই পীরখালে পরে কতবার এসেছি—প্রতিবারেই রোমাঞ্চ বোধ হয়েছে কিন্তু আজকের মত আর কখনো হয়নি।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। এরপর রাইফেলের গুলি দুটো আর একবার দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটা আরম্ভ করলুম।

মেসার্স এন, সি, দাঁয়ের সমরবাবু ৪৫০।৪০০ বোরের রাইফেলটা বিক্রি করবার সময় আমায় বলেছিলেন—চমৎকার জিনিষ, শিকারে এমন বিশ্বস্ত সঙ্গী আর নেই। সেই বিশ্বস্ত সঙ্গীর ওপর নির্ভর করে এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগলুম, প্রতি পদক্ষেপে কান পেতে রাখলুম যদি কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। চতুর্দিকেই জঙ্গল, ঝোপ ঝাড় আর তার ফাঁকে ফাঁকে শুলোর কণ্টক শয্যা। যতই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি ততই কর্দমাক্ত মাটি শেষ হয়ে শক্তি জমির অস্তিত্ব পায়ের তলায় অনুভূত হচ্ছিল। সেই সময় আমার সব থেকে বড় চিন্তা ছিল, বাঘটা কোন দিকে মুখ করে মড়ি খাচ্ছে বা বসে আছে। যদি বাঘটা আমায় দেখতে পেয়ে মাটিতে পেট ঘষড়ে ঘষড়ে এগিয়ে আসে আর একেবারে ঘাড়ের ওপর না পড়া পর্যন্ত দেখতে না পাই, সেই উত্তেজনায় বার বার শুলোয় হোঁচট খাচ্ছিলাম।

অনেকটা আসার পর দেখলাম বানরটা যে গাছ নাড়িয়েছিল সেটা একটা পাইন গাছ। গাছটা তখনো প্রায় একশো গজ দূরে এবং যে জমিটার ওপর দিয়ে তখন যাচ্ছিলুম তা সামান্য উঁচু। জমিটা গজ কুড়ি-পঁচিশ দূরে গিয়ে একটা নালায় নেমে গেছে। বাঘটা পাছে দেখতে পায় সেই ভয়ে এই কুড়ি পঁচিশ গজ উঁচু জমিটায় আমি উবু হয়ে বসে কিছুটা সময় পার করে দিলুম। এতে অনেকটা সময় নষ্ট হল এবং পিছনের সঙ্গীরা অবশ্যই চিন্তিত হয়ে পড়বে, কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাকে এ-পন্থা নিতেই হল। এমন সময় একঝলক হাওয়ায় দুর্গন্ধ ভেসে এল, মনে হল মড়িটা যেন আমার পায়ের গোড়ায় পড়ে রয়েছে, গা গুলিয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে নালাটার মধ্যে নেমে গেলাম। এটা ঠিক নালা নয়, দশ বারো হাত চওড়া একটা নাবাল জায়গা, আগের তুলনায় বেশ নরম—পায়ের আঙুল ডুবে গেল।

এতক্ষণে আমার উঠে দাঁড়াবার সময় হয়েছে, ভেবে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রথমেই দেখতে গেলুম—মড়িটা আর কত দূরে রয়েছে। মাত্র এক পা বাড়িয়েছি, এমন সময় নজরে পড়লো গাছের

মাথায় বানরটা আবার ডাল নাড়াচ্ছে। দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলুম, তাহলে মড়িটা আর পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়! এমন সময় পিঠে আচম্‌কা একটা তীব্র খোঁচা এসে লাগতেই আতঙ্কে মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত শব্দ বের হয়ে গেল। রাইফেলটা নিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো একটা আধশুক্‌নো খোচড়ানো ডাল দোলা লেগে দুলছে! দারুণ আতঙ্কে সেই নিরীহ দোলা দেখলুম। আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে তখন ঘাম গড়াতে লাগলো। কিছুই ঘটেনি, শুধু একটা মোচড়ান ডালে দাঁড়াবার সময় পিঠে খোঁচা লেগেছিল, কিন্তু পরিবেশ সেই তুচ্ছ ব্যাপারকে কি সাংঘাতিকই না করেছিল। ভয়ে তখন প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল, প্রথমেই মনে হয়েছিল নির্ঘাৎ বাঘটাই এসে পিঠে থাবা তুলে দিয়েছে।

সুন্দরবনের জেলে, কাঠুরে ও মৌলীরা বনের পথে হাঁটবার সময় ঝোপ ঝাড়ের ডাল মুচড়ে ভেঙে পথের নিশানা রেখে যায়, আবার সেই নিশানা ধরেই ফিরে আসে। এরকম নিশানা আমিও কতবার কত জঙ্গলে রেখে এসেছি। কিন্তু সেদিন ভাঙ্গা ডালটার খোঁচা খেয়ে এত ভয় পেয়েছিলুম, যে ভাষায় তা বোঝান যাবে না। যে লোকটা সেই ডাল ভেঙ্গে রেখেছিল সে কাঠুরিয়া কিম্বা মৌলী যেই হোক তার ওপর যা রাগ হল—তা আর কহতব্য নয়। আর কোন ডাল সে খুঁজে পেল না! ঠিক ওই ডালটাই তার ভাঙ্গার প্রয়োজন হল, যার আড়াল নিয়ে শিকারী একটা মানুষখেকো বাঘের মুখ থেকে মৃতদেহ ছিনিয়ে আনতে চলেছে!

যাই হোক আমার মুখ থেকে আচমকা নির্গত সেই ভয়ার্ত শব্দটা বাঘ নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি পেলে অবশ্যই সন্ধান করতে আসতো। নাবাল জমিটা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে সামনের উঁচু জমির পাড়ে আস্তে আস্তে উঁকি দিলুম কিন্তু কিছুই নজরে এল না। ঘন পাতার মধ্যে বানরটাকেও আর দেখা গেল না। সামনের উঁচু জমি থেকে নাবাল জায়গাটা আমার বুক সমান গভীর। সুতরাং আমি যখন নাবাল জমিতে দাঁড়িয়ে সামনের উঁচু জমির ওপর রাইফেল রেখে মুখ

বাড়ালুম, তখন আমার বুকের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত বেরিয়েছিল এবং সেই অবস্থায় রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে যখন সামনের ঝোপ-ঝাড় দেখতে দেখতে পঞ্চাশ গজ দূরের পাইন গাছটার গোড়ায় দৈবাৎ চোখ পড়ে গেল, তখন আমার আর নড়বার ক্ষমতা রইলো না। মড়িটা সামনে রেখে মাটিতে পেট দিয়ে সে আমার দিকে আড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার চারটে পা আমার দিকে ছড়ান, ঘাড় বেঁকিয়ে নাবাল জমিটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

রাইফেলের নলটা অল্প একটু বাঁ দিকে সরাতেই মাছিটা তার বুকের উপর বসলো, সেফ্‌টি খোলাই ছিল, ভয়ে ভয়ে ট্রিগার চেপে দিলুম। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা সেই শোয়া অবস্থা থেকেই লাফিয়ে সামনের দিকে পড়লো, তারপর হতভম্বের মত বেঁকে হুমড়ে তির্যক দৃষ্টিতে নাবাল জমিটার দিকে এক পলকের জন্য তাকিয়ে লাফিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমি দ্বিতীয় ট্রিগারে আঙুল রেখে তার বন জঙ্গল ভেদ করে তার ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

বাঘটা চলে যেতেই খুব তাড়াতাড়ি পকেট থেকে গুলি বার করে খালি নলটা আগে ভরে নিলুম, তারপর চোখ ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখতে লাগলুম। আমার ভয় হল বাঘটা অন্য কোন দিক থেকে আচমকা ছুটে এসে আক্রমণ করতে পারে। শোয়া অবস্থায় খুব নীচু জায়গা থেকে (মাটির সমান্তরালে) যদিও বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছি, তবু মনে হল গুলিটা যেন সামান্য নীচু হয়ে গেছে। কারণ বাঘটা লাফিয়ে পড়ে যেভাবে আবার উঠে দাঁড়ালো, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল এ-আঘাত সে সামলে উঠতে পারবে। আমার ত্রুটি আমি নিজেই বুঝতে পারলুম, শোয়া অবস্থায় ঠিক বুক লক্ষ্য না করে যদি আরও ওপরে শিরদাঁড়া বরাবর গুলিটা করতুম, তবে বুকের ঠিক মাঝখানে ঢুকে যেত। কিন্তু আমি গুলি করলুম শোয়া অবস্থায় ঠিক বুক লক্ষ্য করে, যখন সে উঠে দাঁড়ালো তখন দেখা গেল জখমটা বুকের সামান্য নীচে হয়েছে। বাঘের চামড়া অত্যন্ত ঢিলে হওয়ায় জন্যই এমনটা হল।

যাই হোক যা ঘটে গেছে তার আর চারা নেই। তখন নাবাল জমি থেকে উঠে তাড়াতাড়ি কোন গাছে উঠবার মতলবে চারদিকে তাকালুম, সুবিধে মতন একটা গাছও চোখে পড়ল না। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই পাইন গাছটাতেই উঠে পড়লুম, যার গোড়ায় বাঘটাকে গুলি করেছি। গাছে চড়তে গিয়ে দেখলুম মড়ির বুকের সামান্য অংশ থেকে মাথাটা বাকী আছে, আর সব খেয়ে ফেলেছে। পাইন গাছের প্রথম দো-ডালায় বসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। এমন সময় বনের অনেক দূর থেকে বন্দুকের দুম্‌দুম্‌ করে চারবার আওয়াজ হল, তারপর সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ কেটে গেল আর কোন সাড়া শব্দ নেই, মড়ির কাছে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

এমন সময় সুধীর জানা ও বাওয়ালী আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসছিল, ওদের কণ্ঠস্বর শুনে সাড়া দিয়ে আমি নেমে পড়লুম। দেখলুম শিকারী দুজনও ওদের পিছনে পিছনে আসছে। সবাই এসে মড়ি দেখলো, তারপর আমি যেখানে গুলি করেছিলুম সেই জায়গাটা দেখলো, অল্প একটু রক্ত পড়ে রয়েছে। বাওয়ালী জানালো বাঘটা মারা পড়েছে। আমার গুলি খেয়ে সোজা ওদের সামনে এসে যেই দাঁড়িয়েছে, অমনি দুটো বন্দুক থেকে পর পর চারটে এল. জি. গুলি ওকে ঝাঁঝরা করে দিল। বাঘটা আর একটুও শব্দ না করে দাঁতে দাঁত দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বসে পড়লো, থরথর করে কাঁপছিল রক্তাক্ত দেহটা তারপর এক সময় পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো হাঁ করে। ধীরে ধীরে মুখ আবার বন্ধ হয়ে গেল, ল্যাজ একবার অল্প একটু নড়লো শুধু—তারপর সব স্থির হয়ে পড়ে রইলো। তখন বেলা দশটা। কিন্তু বানরটাকে আর কোথাও দেখা গেল না, বন্দুকের শব্দ শুনে নিশ্চয়ই ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে।

চারজন দাঁড়ীকে নৌকো থেকে আনা হল, মোট ন'জনে মিলে মড়ি আর বাঘ বয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে গেলুম। খালের চরে পৌঁছে মৃতের একটুকরো ছেঁড়া কাপড় একটা ঝোপের ডালে বেঁধে

দেওয়া হল। আর কিছুক্ষণ পরেই জোয়ার আসবে, শিষেতে জল ঢুকবে তির তির করে। মানুষ ও বাঘের তুটো রক্তই যখন ধুয়ে যাবে, তখন জেলেরা আসবে সেখানে মাছ ধরতে। সেদিন জন মানব শূন্য পীর খালে নিশানাটাই শুধু উড়তে লাগলো পত্‌পত্‌ করে··· !

সুন্দরবনের বিচিত্র মানচিত্রখানা যদি কখনো খুলে ধরেন তো দেখতে পাবেন খণ্ড খণ্ড দ্বীপগুলো অসংখ্য নদী-নালা ও খাল বিলের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত হতে হতে বঙ্গোপসাগরের কোলে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, যার পরে মাটির আর কোন চিহ্ন নেই—শুধু থৈ থৈ করছে অথৈ জল, শেষ প্রান্তের সেই দ্বীপের নাম—মায়াদ্বীপ। পূর্ব নাম ডালহৌসী আইল্যাণ্ড।

এই দ্বীপের পূর্বাংশে রয়েছে এক বিশাল নদী, তার নাম ভাঙ্গাতুলী। আর পশ্চিমাংশে চোখে পড়বে দিগন্ত-বিস্তৃত এক অপূর্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত জল-রাশি, যার কোন কূল কিনারা খুঁজে পাবেন না, সেই তুরন্ত নদীর নাম—মাতলা। নদীর বিস্তৃতি এখানে ছ-সাত মাইলের মত। তরঙ্গ সঙ্কুল মাতলা পশ্চিমাংশে যেখানে প্রথম মাটি স্পর্শ করেছে, সেই দ্বীপের নাম—'হ্যালিডে-আইল্যাণ্ড'। পশ্চিমবঙ্গের এক মনোরম অভয়ারণ্য। সেই অভয়ারণ্যের তীরে দাঁড়িয়ে যদি কোন জোরালো দূরবীনে দেখা সম্ভব হত, তাহলে দেখতে পেতেন ঠিক আপনার সামনে একটা তীক্ষ্ণ কোণের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কোণের নিম্ন বাহু ধরে নেমে এসেছে মায়া-দ্বীপের সীমা-রেখা, আর উর্ধ্ববাহুতে এসে শেষ হয়েছে সংলগ্ন দ্বীপ ছোটা হরদির সীমানা। মাতলার তীব্র স্রোত একদা সেই কোণ চিরে ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হয়েছিল ভাঙ্গাতুলীর গাঙে। তারপর পলিমাটি জমে জমে ভরে উঠেছিল সেই খাদ। বর্তমানে দেখবেন তুটো দ্বীপের কোল ঘেঁষে তির তির করে বইছে এক সরু খাল। তু'পাশের নিবিড় বন ঝুঁকে এসেছে সেই খালের বুকে।

তবু সবাই ভয় পায় এ-খালে ঢুকতে, বলে মরণ খাল! কিন্তু

সরকারি মানচিত্রে দেখবেন এর বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। সেখানে ছোট্ট করে লেখা আছে—'লক্ষ্মী খাল'। সেই লক্ষ্মী খালে এক বাঘিনী এসে আস্তানা গেড়েছিল। বনের হরিণ শুয়োর মেরেই সে সন্তুষ্ট হল না, নজর দিল জেলে-কাঠুরে আর মৌলীদের ওপর। তারপর মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উড়িয়ে দিয়েছে একটার পর একটা সেই 'নিশানা'। যা দেখলে দিনমানেই হৃৎকম্প হয়, নিশুতী রাত্রে 'বাঁচাও-বাঁচাও-বাঁচাও' বলে হাহাকারে কেঁদে ওঠে, এ সেই সুন্দরবনের মরণ-নিশানা। তবু খাল ভর্তি মাছ, চাক ভর্তি মধু আর অজস্র কাঠের লোভে ওরা না এসে পারে না, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে। বন-বিবি সন্তুষ্ট হলে ফিরে যায় হাসি মুখে, নইলে খালের চরে ছেঁড়া কাপড় টাঙ্গিয়ে দাঁড় বাইতে হয় চোখ মুছতে-মুছতে।

সেবার সৌকত আলীরা এসে বললো, বাঘিনীর ছুটো বাচ্চা হয়েছে। খালে মাছ ধরতে গিয়ে দেখেছে এতটুকু ছোট্ট ছোট্ট থাবা। আমার আষাঢ় মাসে জন্ম, 'বর্ষণ-মন্দ্রিত-অন্ধকারে' আষাঢ়ে স্বপ্ন দেখতে হয়তো ভালবাসি। মুগ্ধ হয়ে যেন দেখলুম চমৎকার ফুট ফুটে বাচ্চা ছুটোকে। মানুষখেকোটা 'মা' হয়েছে! বালিয়াড়ীর ধারে শুয়ে বাচ্চাদের দেখছে। আর বাচ্চা ছুটো—যাদের পায়ের নলি তখনও শক্ত হয়নি, থাবার পরিধি বেড়ালের মত—লাফালাফি, ঝাঁপা-ঝাঁপি করে মাকে জ্বালাতন করছে, বুকের ছুধ খাচ্ছে, পরমুহূর্তেই দূরে ছুটে গিয়ে মাকে কত ভাবনায় ফেলেছে দেখে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে বুকে। ছুরন্তপনায় নাস্তানাবুদ করে তুলছে মাকে, আর মানুষখেকোটা স্নেহময়ী মায়ের মত সব অত্যাচার, জ্বালাতন কেমন তৃপ্তির সঙ্গে নির্বিবাদে সহ্য করছে। কখন গা চেটে আদর করছে, আবার কখন থাবা ছুঁড়ে বা ল্যাজ ছুলিয়ে খেলার ছলে শিকার শেখাচ্ছে। কখনো আবার চোখ পাকিয়ে হয়তো বলছে—ছিঃ, লক্ষ্মী সোনা ছুষ্টুমি কোরো না।

১৯৬৯ সালের ১৪ই নভেম্বর সুন্দরবনে যাবো ঠিক করা ছিল, কিন্তু তার হপ্তা খানেক আগে সাকার আলী এসে খবর দিল

বাচ্চা দুটো মরে গেছে। সুন্দরবনে এসে প্রথমেই বাচ্চা দুটোর খবর সংগ্রহ করেছিলুম। বাচ্চা দুটো কেন বাঁচলো না, জানি না। বাঘিনী মরা বাচ্চা-দুটোকে দাঁতে ঝুলিয়ে খালের ধারে হেঁতাল বনের তলায় শুইয়ে রেখেছিল। অসংখ্য পায়ের ছাপে বোঝা গেল, সে অনেকবার বাচ্চা দুটোকে এসে দেখে গেছে। আমি যখন লক্ষ্মী-খালে এসে পৌছলুম, তখন একটা মরা বাচ্চা খালের জলে পড়ে গেছে আর দ্বিতীয়টা পচে দুর্গন্ধ উঠছিল, লোম খসে খসে বাতাসে উড়ছিল। বাঘিনী তখন ক্রোধে পাগল হয়ে উঠেছে, তেড়ে তেড়ে আসে। তার বুক কাঁপানো ডাক শুনে বনের হরিণ-শুয়োর কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছে কেউ জানে না। নির্জন চরে সমুদ্রের বাতাস এসে হু-হু করে আছড়ে পড়ে, ঝাউবনের পাতায় পাতায় কেমন একটা বিষণ্ণ সোঁ-সোঁ শব্দ ওঠে। চাঁদনী রাতে বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হরিণের টাউ-টাউ ডাক আর শোনা যায় না। দুপুর বেলা যখন বাতাস পড়ে যায়, কেমন একটা গুমোট ওঠে—তখন বন যেন খাঁ খাঁ করে, গাছের ঝরা পাতার সামান্য শব্দেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

১৪ই নভেম্বর যে অভিযান শুরু করেছিলুম, সুন্দরবনে সেই আমার শেষ যাত্রা। সঙ্গে ছিলেন, অনিল দাস, শচীনন্দন মিত্র ও দ্বিজেন রায়চৌধুরী। ভাঁটার টানে তখন পিয়ালীর জল তর্ তর্ করে নেমে যাচ্ছিল, সেই টানে নৌকো ভাসিয়ে দিলুম। পিয়ালী ছোট্ট নদী, ছোট্ট তার ঢেউ—দিনের শেষ আলোয় কিশোরীর মত যেন নাচতে নাচতে চলেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হল, নির্জন নদী-তীর। দিনের কর্ম-ব্যস্ততা ফুরিয়ে গেছে কখন, ওপারের কুল ঘেঁষে সারবন্দী হয়ে চলেছে খড়ের নৌকো। গোলাপ গঞ্জের ঘাটে মাঝিরা নৌকো বেঁধে হ্যারিকেন জ্বেলে রান্না করছে, কেউ বা তামাক খাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছিল গ্রাম্য কুকুরের ডাক, হঠাৎ অন্ধকারে চোখে পড়লো একটা বাঁশের মাচা, তার ওপর বসে কে বাঁশী বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল পিয়ালী, মাতলার দুরন্ত বুকে কখন হারিয়ে গেছে সে বুঝতে পারি নি।

চমক ভাঙ্গলো যখন দোল দিল মাতলা, ফুলে উঠলো কালো জল—ফুঁসে উঠলো দুরন্ত ঢেউ। মোহানার কাছে যার বিস্তৃতি প্রায় ছ-সাত মাইলের মত, মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে চললো নৌকো ওপারের লক্ষ্মী খাল অভিমুখে। সারারাত চলবে নৌকো, ছপ্-ছপ্ করে দাঁড় ফেলার দ্রুত শব্দ হতে লাগলো।

ধূ-ধূ করছে অনন্ত জলরাশি, মাথার ওপর কালো আকাশ, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। শুধু জল আর জল, আর ভেঙ্গে পড়া ঢেউয়ের ফোঁস-ফোঁসানি। দাঁড়ীরা মাঝে মাঝে দাঁড় বদলায়, ডান দিকের লোক আসে বাঁ-দিকে, আর বাঁ-দিকের লোক যায় ডান দিকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে বিড়ি তামাক। হ্যারিকেনটা কেবলই দোল খায়, ঝলকে ঝলকে ভুষো উঠে মাথাটা কালো হয়ে যায়। তবু হ্যারিকেনটা জ্বলতে থাকে, শেষে ভুষোর কালিমায় যখন ঢেকে যায় আলোর শেষ মহিমাটুকু, তখন পুব আকাশে আভা ফুটে ওঠে। একটা রাতের অবসান ঘটিয়ে মাতলার বুক রাঙিয়ে ভেসে ওঠে সূর্য! মাতলার বুকে সূর্যোদয় বর্ণনাতীত!

সেই আলোর সাড়া পেয়ে যখন সলুইরা ভাসতে ভাসতে উড়ে গেল, তখনই আমরা লক্ষ্মীখালে প্রবেশ করলুম। ক্লান্ত মাঝিরা ঘুম-ঘুম চোখে দেখলো লক্ষ্মীখালের বন। সাকার আলী বললো, আগে খাবার ব্যবস্থা হোক—তারপর দুপুর বেলা দেখবো কে কত ঘুমুতে পারে। রাইফেল হাতে পাহারা দিতে দিতেই ওরা মাছ ধরলো, যখন রান্না হচ্ছে, এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বনে উঠলুম। নদী তীর থেকে বনের কোল পর্যন্ত লম্বা বালির চড়া, মধ্যে মধ্যে বর্ষার জল-বওয়া কতকগুলো শুকনো নালা পার হয়ে যে জায়গায় এসে পৌঁছলুম, তার দক্ষিণ দিকে তিন চার ফুট উঁচু একটা ঘাসের জঙ্গল। ঘাসের জঙ্গলটা প্রায় দুশো গজের মত লম্বা আর চওড়ায় প্রায় দেড়-শো গজের মত। এরপরই শুরু হয়েছে বন।

জলের রেখা থেকে বালির চড়ার প্রস্থ প্রায় তিরিশ চল্লিশ গজের মত। সমুদ্রের হাওয়ায় বালি উড়ে এসে বালিয়াড়ীর সৃষ্টি করেছে,

তার উচ্চতা কম বেশী তিন চার ফুট। এই বালিয়াড়ীর ওপাশ থেকেই ঘাসের জঙ্গলটার শুরু, তার কোলে এক সার ঝাউগাছ। যেখান থেকে ঘন জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে সে বনের তলাটা বাইন চারায় ভর্তি, আর অসংখ্য পিস্সু পোকা সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে। পিস্সু পোকা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না, অথচ কামড়ালে মনে হবে যেন পায়ে অসংখ্য সূচ ফোটানো হচ্ছে। সেই বাইন বনের ধারেই বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখলুম, সেই ছাপ বালিয়াড়ীর ধারে এসে বেশ কয়েকটা পাক্ দিয়ে আবার বনের মধ্যে ঢুকে গেছে।

বালিয়াড়ীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়লো নূতন একখানা খদ্দরের চাদর বাতাসে এলো মেলো হয়ে একটা গাছের গোড়ায় জড়িয়ে রয়েছে। কোন্ হতভাগ্যের শেষ চিহ্ন কে জানে, ঘটনাটি কিন্তু খুব সম্প্রতি ঘটেছে বলে মনে হল। হয়তো চার-পাঁচ দিনও হয়নি, অল্প একটু খোঁজা খুঁজি করতে গিয়ে দেখি নাড়ী ভুঁড়ির একটা শুক্‌নো কালো মত দলার ওপর এক ঝাঁক মাছি ভন্ ভন্ করছে। আর তার অদূরেই কাপড়ের কয়েকটা টুকরো বাইন গাছের গোড়ায় আটকে রয়েছে। আমরা চারজনেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলুম, তারপর নৌকোয় ফিরে এলুম।

মাঝিরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, সেই অবস্থায় তাদের রেখে বনে যাওয়া সম্ভব হল না। সুতরাং লক্ষ্মীখালে আমাদের প্রথম দিনটা এইভাবে নষ্ট হল। অতিকষ্টে মাত্র দশ দিনের একটা পারমিট সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম তার প্রথম দিনটাই এইভাবে খতম হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিনে বালিয়াড়ীর ধারে যেখানে খদ্দরের নতুন চাদরটা পড়ে, আসতে দেখেছিলুম, তার কাছেই একটা ঝোপের তলা পরিষ্কার করে দ্বিজেনবাবু একজন মাঝিকে নিয়ে বাঘিনীর আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর অনিলবাবু ও শচীনন্দনবাবু আরও দূরে সেই ট্যাকের কাছে এমন একটা জায়গা পছন্দ করে বসলেন, যার চতুর্দিকেই আড়াই থেকে তিন ফুট মোটা সূচলো শুলোয় ঘেরা। বন থেকে বেরিয়েই নদীর ধারে আসতে হলে ঘাঁটিটা খুবই মোক্ষম,

অসংখ্য হরিণ শুয়োরের চিহ্নের সঙ্গে বাঘিনীরও টাটকা পায়ের ছাপ রয়েছে। তাছাড়া বাঘিনী গত রাত্রে সেই শুলোর ধারে প্রস্রাব করেছিল, তারও চিহ্ন এবং দুর্গন্ধ তখনও সেখানে বর্তমান।

সঙ্গীদের ব্যবস্থা হতেই আমি রাইফেলটা বগলে করে দ্বীপের চৌহদ্দি ঘুরে দেখতে গেলাম। প্রায় আড়াই শো গজ মতন পায়ের পাতা ডোবা নরম বালির উপর দিয়ে যাওয়ার পর এল একটা মোটা আস্তরণ, এখানেই বালিয়াড়ী ভেঙ্গে তীরের সঙ্গে সমতল হয়েছে। এখানে পথটা নদীর তীর ছেড়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ বনের ভিতর ঢুকে পড়েছে। অসংখ্য হরিণ শুয়োরের চিহ্নের ওপর দিয়ে বাঘিনীও হেঁটেছে। বাঘিনীর চলার ধরণ দেখে অনুমান করলুম, হয়তো এই পথেই সে দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করে। কখনও শুলোর ধার দিয়ে বনে ঢোকে বা বেরিয়ে আসে, আবার কখনও সরাসরি বালিয়াড়ী অতিক্রম করে বাইন বনে চলে যায়। বাঘিনীর চলাচলের পথ সন্ধান করে খালের কাদা ভেঙ্গে ওপারে যেতেই একটা পুরুষ বাঘের পায়ের ছাপ চোখে পড়লো।

এমন সময় হরিণ ডেকে উঠতেই তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে বসলুম। সুন্দরবনের সব কিছুই হঠাৎ হঠাৎ ঘটে। সুতরাং হঠাৎ যদি একটা হরিণ বা বরা পাই তাহলে বাঘিনীকে টোপ্ দিতে পারবো আর যদি পুরুষ বাঘটাই বেরিয়ে আসে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে আসার উপক্রম হল তবু কোন জন্তুর সাড়া পেলাম না। হঠাৎ একটা ছোট হরিণ কোথা থেকে ছুটে এসে থমকে দাঁড়ালো এক মুহূর্তের জন্য, তারপর চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। হরিণটা এত ছোট যে গুলি করতে ইচ্ছে হল না। আমি বাঘের আশায় আরও অনেকক্ষণ বসে রইলুম, কিন্তু সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসায় গাছ থেকে নেমে নৌকো অভিমুখে হাঁটা দিলুম।

ভুল করেছিলাম কতটা পথ এসেছি তার হিসেব না রেখে, ফলে লম্বা লম্বা পা ফেলতে হচ্ছিল, কিন্তু শীতের সন্ধ্যা নেমে এল তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। অন্ধকারে কাদায় হড়কাতে হড়কাতে যখন

নৌকোয় এসে উঠলুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, নৌকোতে হ্যারিকেন জ্বলছিল। কোন কথা না বলে প্রথমেই ফ্লাস্ক খুলে ঢক্ঢক্ করে চা খেতে লাগলুম। এমন সময় অনিলবাবু জানালেন, বাঘিনীর ওপর ফায়ার করা হয়েছে। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, কে ফায়ার করেছেন? তখন শচীনন্দনবাবু গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, দ্বিজেনবাবু। আমি তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ'নামিয়ে রেখে প্রৌঢ় শিকারী দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে ঘটনাটা জেনে নিলুম, সংক্ষেপে তা এই রকম :

বেলা চারটের সময় দ্বিজেনবাবু দেখলেন বাইন বনের ভিতর থেকে কি একটা জন্তু আসছে—প্রথম ভাবলেন হরিণ, কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন বাঘিনী। ফাঁকায় বেরিয়ে এসে সে ঘাস বনটায় দাঁড়াল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সমস্ত বনটা একবার চকিতে দেখে নিয়ে সোজা তাকাল বালিয়াড়ীর দিকে, যেখানে তিনি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন সেই দিকে। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে তিনি তখন আড়ষ্ট হয়ে বসে, এমন সময় বাঘিনী হঠাৎ মাটি আঁচড়াতে লাগলো। তারপর লম্বা হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লো, থাবা দুটো সামনেব দিকে প্রসারিত করে মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে রইলো বালিয়াড়ীর দিকে, যেখানে সেই খদ্দরের চাদরটা পড়েছিল।

দূরত্ব প্রায় দুশো গজ, দ্বিজেনবাবুর পক্ষে তখন একচুলও নড়বার উপায় নেই। রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে নিঃশব্দে ঘামতে লাগলেন। প্রায় সাড়ে চারটে যখন বাজলো তখন বাঘিনী হঠাৎ কোন শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে সেইদিকে দেখতে লাগলো। এদিকে দ্বিজেনবাবু ভাবলেন বাঘিনী বোধহয় সেই শব্দ লক্ষ্য করে চলে যাবে। তাঁর হাতে তখন '৪৫ বোরের দোনলা রাইফেল, কিন্তু দুশো গজ দূরে একটা নিখুঁত গুলি ছোঁড়ার পক্ষে রাইফেলটা হয়তো ঠিক উপযোগী নয়। বাঘিনী যদি কোন কারণে আরো একশো বা দেড়শো গজ এগিয়ে আসতো তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না, বাঘিনীকে ঠিক পেড়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু বাঘিনী সে রকম কোন লক্ষণ

দেখালো না বরং দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই যেন বেশী! দ্বিজেনবাবু আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, সেই দুশো গজের দূরত্বে নিশানা নিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

রাইফেলের আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই শোয়া থেকেই এক আশ্চর্য বাঘিনী সোজা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। তারপর একরাশ ধূলো উড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল। পরের দিন সকাল বেলা সেখানে গিয়ে দেখি গোল হয়ে কাটা এক টুকরো চামড়া সেখানে পড়ে রয়েছে, আরও আশ্চর্য হয়ে দেখলুম বাঘিনী রাতের কোন এক সময় এসে সেই জায়গায় আবার পায়চারি করেছে এবং নখ দিয়ে মাটি আঁচড়েছে। গুলি খাওয়ার পর বাঘিনী পুরনো জায়গায় ফিরে এসে কেন এমন আচরণ করেছিল বুঝতে পারলাম না। রোমশ চামড়াটুকু হাতে নিয়ে বেচারা দ্বিজেনবাবু ভাবতে লাগলেন বাঘিনী আর একটু এগিয়ে এলে এ জিনিষ হত না। গুলি সামান্য উঠে যাওয়ার দরুন বাঘিনীকে পেয়েও ঠিকমত ঘায়েল করতে পারলেন না।

এরপর শচীনন্দনবাবু বাঘিনীকে মারবার জন্য ঝাউ-বনে একটা মাচা বাঁধলেন। বাঘিনী যেখানে শুয়েছিল, সেখান থেকে মাচার দূরত্ব রইলো প্রায় ষাট-সত্তর গজ। দূরত্বটা সংক্ষেপ করবার কোন উপায় ছিল না, কারণ সেই ফাঁকা জায়গায় আর কোন উপযুক্ত গাছ না থাকায় অসুবিধাটুকু ভোগ না করে উপায় নেই।

যাইহোক, বেলা চারটের সময় শচীনন্দনবাবু সাকার আলীর সঙ্গে মাচায় বসলেন। '৪০৪ বোরের জেফ্রি রাইফেলটা তুলনামূলক ভাবে ভালো, তবু হেভীবোর রাইফেলের পক্ষে দূরত্বটা সামান্য বেশী। তিরিশ-চল্লিশ গজ হলেই সব থেকে ভালো হত। সময় কেটে যেতে লাগলো, গতকালের সেই চারটে চল্লিশ মিনিটও পার হয়ে গেল। তখনও বাঘিনীর দেখা নেই। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল, দিনের শেষ ম্লান আলো তখন গাছের মাথায় চিক্‌চিক্ করছিল। আসন্ন সন্ধ্যায় শচীনন্দনবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এদিকে সাকার আলী টর্চ আনতে ভুলে গেছে। এমন সময় সেই আলো আঁধারিতে বাঘিনী হঠাৎ এসে

হাজির হল। সে নিশ্চয় বাইন বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার আচরণ থেকে। পিস্সু পোকার কামড়ে বাঘিনী সারাক্ষণ ছটফট করতে লাগলো, এক মিনিটও কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ালো না। তখন আলো প্রায় নেই বললেই চলে, শচীনন্দনবাবু সেই চলমান অস্থির বাঘিনীর কাঁধ লক্ষ্য করে রাইফেলের ঘোড়া টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী লাফিয়ে উঠলো এবং ডান দিকের বনে ছুটে গেল। শচীনন্দনবাবু পরিষ্কার দেখতে পেলেন গুলিটা বাঘিনীর চার পায়ের ফাঁকে খানিকটা ধূলো উড়িয়ে দিল শুধু। সাকার আলী বললো, আপনাদের ভাগ্য চলে গেল—বাঘিনী তারপর দু'বার সুযোগ দিয়েছে। আর ওকে কেউ মারতে পারবে না। তারপর রাত ঘন হল, মাঝে মাঝে হরিণের ডাক শোনা গেল, কিন্তু বাঘিনীটা একবারও ডাকলো না।

এরপর বাঘিনীকে আর দেখা গেল না, এমন কি যে যে জায়গায় তার পায়ের ছাপ পড়তে দেখা গেছে সেখানেও কোন চিহ্ন নেই। বাঘিনী যেন হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে গেল। পর পর দুটো গুলি হয়তো তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে আরও দুটো দিন কেটে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই শীতকালে প্রচুর জল কাদা ঘাঁটাব ফলে আমি খুব সুস্থ বোধ করছিলুম না। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লেগে গেল। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো আর একটা শুকনো কাশি খুব কষ্ট দিতে লাগলো। ইতিমধ্যে পাঁচদিন কেটে গেছে, আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। এর মধ্যে বাঘিনীকে আর একবার খুঁজে বার করতে হবে, কারণ তার সঙ্গে আমার তখনও কোন মোকাবেলা করা হয়নি। কিন্তু এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আমি বিশেষ ক্লান্ত বোধ করলুম না। সুন্দরবনের জল হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। হজম শক্তি অত্যধিক বাড়িয়ে দেয়, এত মাছ মা স খেয়েও কোনদিন পেটের অসুখ হয়নি বর, শরীরটা সব সময়ই যেন বেশ তর তাজা মনে হত।

ষষ্ঠ দিনে প্রায় আড়াই মাইল হেঁটে সেই ট্যাঁকের কাছে বাঘিনীর চলাচলের একটা পথের ওপর মাচা বাঁধলুম। স্থান নির্বাচন প্রথম

দিনই করে রেখেছিলুম। সুন্দরবনে সমুদ্রের ধারের দ্বীপগুলোতে বড় গাছ বিশেষ চোখে পড়ে না। যে গাছে মাচা বাঁধলুম তার উচ্চতা মোটেই নিরাপদ নয়—মাত্র সাত ফুট উঁচু। কিন্তু সুন্দরবনে এ-ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঘিনীর টহল দেওয়া পথ পাহারা দিতে হলে যে গাছে বসা উচিত, তাব উচ্চতা সুন্দরবনের প্রাকৃতিক নিয়মে যতটা হওয়ার কথা—ঠিক ততটাই এ-ক্ষেত্রে হয়েছে। মানুষখেকোর জঙ্গলে মাত্র সাত ফুট উচ্চতায় বসে কোন শিকারীই স্বস্তি পান না। আমি মাচায় কোন সঙ্গী নিই না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটলো। যারা মাচার সরঞ্জাম বয়ে আনতে সাহায্য কবেছিল তাদের তখন কার হেফাজতে ফেরাই? নৌকো সেই আড়াই মাইল দূরে। সেই আড়াই মাইল পথও কম নয়, বিশেষত সুন্দরবনে—দেখলুম সঙ্গীদের চোখেও ভয়ের সেই ছায়া। অগত্যা তুলে নিলুম ওদের মাচায়, ছোট মাচা খুবই অসুবিধা হবে। হাত পা নড়ানোর জায়গাও থাকবে না, তবু নিরুপায়, কারণ ওদের নিরাপত্তার প্রশ্ন সবার আগে। তখন এমন সময় ছিল না যে আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে ওদের পৌঁছে দিতে পারি।

অনিলবাবু গাছে উঠেই মাচার ডান দিকে বসে পড়লেন, আমি বসলুম বাঁ-দিকে আর আমাদের মাঝি মনোহর মণ্ডল বসলো আমার পিছনে। এই মনোহর মণ্ডল আমাকে অনেকবাব বলেছে—সুন্দরবনে এতদিন ঘুরছি, কিন্তু কখনো বাঘ দেখিনি। সেই মনোহর মণ্ডল শেষ পর্যন্ত বাঘ দেখেছিল দু'বার। একবার আমার মাচায় বসে, আর একবার বাঘটা যখন এসে ওর গলায় কামড় বসাচ্ছিল তখন। যাই হোক, মাচায় আমরা সেট হয়ে গেলুম, ডান দিকে বসবার ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু আর নড়াচড়া করা উচিত নয়। বাঘিনীর জন্য কোন টোপ সংগ্রহ করতে পারিনি। তাকে দেখা মাত্র গুলি করতে হবে, কারণ চলাচলের পথে সে থামবে না। শীতের সময় আবার সব জন্তুই একটু দ্রুতগামী হয়ে ওঠে, তারাই আবার গ্রীষ্মকালে কিছুটা মন্থর। অতএব তীক্ষ্ণ নজর ও ক্ষিপ্রতার ওপরই নির্ভর করছিল আমার হার জিতের প্রশ্ন।

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল বনের তলায়, ঝাঁড়ীর মধ্যে যে অন্ধকার ঘন হচ্ছিল ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, দিনের শেষ আলোটুকু নিঃশেষে মুছে রাতের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলো। যা ছিল এতক্ষণ স্বচ্ছ, শঙ্কা শূন্য, তা নৈশ স্তব্ধতায় এক অজানা উদ্বেগে ভীতি-প্রদ হয়ে চঞ্চল শিরায় শিরায় যেন এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করতে চাইল। পাখীদের ডাক থেমে গেছে, নীরব নিস্পন্দ বন, নদীর শব্দের সঙ্গে পোকা-মাকড়দের ডাক ভেসে আসছিল।

সেই শব্দহীন নিস্তরঙ্গ অন্ধকারে একটা হরিণ আমার মাচার তলা দিয়ে চলে গেল, সাদা বালির ওপর সচল ছায়াটা দেখলুম। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে কি একটা পাখী সামনের গাছটায় এসে বসেছিল, এতক্ষণ পরে সে হঠাৎ ডানা ঝটপট করে গুছিয়ে বসলো সারা-রাতের মত। অনড় হয়ে বসেছিলুম আমরাও। একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকার দরুন পায়ের গাঁটে গাঁটে খিল্ ধরে যাচ্ছিল, কোমর ব্যথা করছিল, আর সেই অসহায় অবস্থায় মশারা নির্বিবাদে হুল ফোটাতে লাগলো। বাত যতই বাড়তে লাগলো ততই ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগলুম। শিকারের পারমিট পাওয়ার দিন থেকেই আমি অসুস্থ ছিলুম। জ্বর, সর্দি, মাথার যন্ত্রণা ও সর্বাঙ্গের ব্যথা এতদিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, কিন্তু তখন গ্রাহ্য না করে আর উপায় রইলো না। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে অনবরত কাঁচা-জল ঝরতে লাগলো, কাশির দমক্ বাড়লো—রুমালটা মুখে ঢুকিয়ে দিয়েও রেহাই নেই। যে কোন মুহূর্তে বাঘিনী এসে পড়তে পারে, দুর্ভাবনায় ক্রমাগত নাকের ও চোখের জল মুছে হাঁপিয়ে উঠলুম। তখন গভীর রাত, দুটো কি আড়াইটে।

ছোট্ট মাচায় তিন জনে জড়সড় হয়ে বসায় যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছিল, অনবরত ঠেকাঠেকি লেগে যাচ্ছিল। অথচ কথা ছিল বাঘিনীকে দেখতে পেলেই হাঁটুতে হাঁটু ঠুকে ইসারা করবে। ইতিমধ্যে হাঁটুতে হাঁটুতে অনেক ঠোকাঠুকি হয়েছে, কোনটা ইসারা আর কোনটা অস্বস্তি বোঝা দায়। মাচা থেকে নেমে গেলেই হত, এমন সময় অখিলবাবু আর থাকতে পারলেন না, দারুণ উত্তেজনায় ফিস্ফিস্ করে

বলে উঠলেন, বাঘ-বাঘ! জঙ্গলে যত বিচিত্র শব্দই হোক না কেন বন্য জন্তুরা বিশেষ ভয় পায় না, কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর কানে গেলেই মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া। আমার নড়াচড়া করার কোন উপায় ছিল না, তবু গলা লম্বা করে অনিলবাবুর ঘাড়ের ওপর দিয়ে কোন গতিকে দেখলুম একটা কালো ছায়া।

বলতে ভুলে গেছি, যে গাছটায় মাচা বাঁধা ছিল—সেটা একটা হেলানে-গাছ। অর্থাৎ গাছটা মাটি থেকে উঠে প্রায় চার-পাঁচ হাত মাটির সমান্তরালে বেড়ে উঠে তারপর সোজা হয়ে আকাশ মুখো হয়েছে। সুতরাং বাঘিনী ইচ্ছা করলে গাছ বেয়ে ওপরে উঠে আসতে পারবে। আর একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি, বনের মধ্যে এই রকম হেলানে-গাছ দেখলেই সন্দেহ করা উচিত। কারণ বাঘ সাধারণত চলার পথে এই রকম গাছ দেখলেই তার গোড়ায় প্রস্রাব করবে ও আঁচড়াবে।

গাছের গোড়ায় ছায়া মূর্তিটা তো দেখলাম, এখন সেই ভীড়ের মধ্যে রাইফেল ঘোরাই কেমন করে? রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নীচু করতে না করতেই ছায়া মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওই একটা কথা, বাঘ বাঘ! আর মুহূর্তেই কানে এল থপ্ থপ্ শব্দ, বাঘিনী লাফিয়ে চলে গেল। অনিলবাবু আমাকে শুরু থেকেই ইসারা করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু আমি ভেবেছিলুম অস্বস্তি, বাঘিনী যখন গাছের গোড়ায় থাবা তুলে আঁচড়াতে আরম্ভ করলো তখনই অনিলবাবু ভেবেছিলেন—বাঘিনী বুঝি ওপরে উঠে আসছে।

সকাল হল। যে বাঘিনীর আশায় এত কষ্ট স্বীকার করলুম, মাচা থেকে নেমে দেখি সে নয়, খালের ওপারের সেই পুরুষ বাঘটা বালির ওপর কতকগুলো গোল গোল দাগ রেখে গেছে—বাঘিনীর পায়ের ছাপ একটু লম্বাটে। অসুস্থতার দরুন পরের রাতটা বিশ্রাম নিলাম।

অষ্টম রাত্রে আবার মাচায় এসে বসেছি, এবার কোন সঙ্গী নেই তাছাড়া গাছটাও বদলে নিয়েছি। উন্মুখ হয়ে বসেছিলুম, ক্রমেই রাত্ত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনেক দূর থেকে হরিণের একটা সতর্ক সূচক ডাক ভেসে এল। হরিণটা ডেকে ডেকে অন্যান্য প্রাণীদের যেমন সাবধান করে দিল তেমনি আমাকেও সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দিল। ডাকটা ক্রমশই আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। প্রথমে ভাবলুম হরিণটা বাঘ দেখে পালিয়ে আসছে, হয়তো বাঘটা ওর পেছু নিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করে বাঘিনী আচমকা ডেকে উঠলো। বাঘিনী ও হরিণের দুটো ডাকই যেন সম-দূরত্ব থেকে আসছিল। আবার একবার সেই ডাক শুনে বুঝতে পারলুম, ওরা সমান্তরালে হাঁটছে। হরিণটা ডাকছিল বনের মধ্য থেকে, আর বাঘিনীর ডাক ভেসে আসছিল নদীর ধার থেকে। ব্যাপারটা ক্রমশই উপভোগ্য হয়ে উঠলো। হরিণের ভয়ার্ত ডাক থামতেই বাঘিনী মৃদু সাউ সাউ শব্দ করে রাতের সেই শেষ প্রহরে হয় হরিণটাকে ভেংচে আমোদ করেছিল, নয়তো এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছিল যেখানে ওর সুবিধা বেশী। কিন্তু ডাকের বহর দেখে ধারণা হল বাঘিনীর ঝোঁক প্রথমের দিকে। চঞ্চল হরিণটাকে ধরবার চেষ্টায় ছিল না, হাঁটছিলও অত্যন্ত মন্থর গতিতে। খিদের তেমন তাড়া হয়তো ছিল না, তা-ছাড়া হরিণের ডাকে বাঘিনীর সাড়া দেওয়ার শব্দ বেশ মোলায়েম ও রহস্যময়! হরিণের ভয়ার্ত ডাকে বাঘিনীর আমুদে প্রত্যুত্তর শুনে যেমন পুলকিত হয়ে উঠলুম, তেমনি অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে এমন রসিকতা হয় এ গোপন তথ্য তো আগে জানা ছিল না, এমন রহস্যালাপ আর কোথাও শুনিনি! প্রাণ ভরে উপভোগ করলুম সেই গোপন রহস্য। একটা অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী ও পৃথিবীর হিংস্রতম জীবের সেই আশ্চর্য বন্য রসিকতা, এ এক অভিনব নৈশ অভিসার!

ডাক দুটো যখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়লো, তখন রাইফেল তুলে নিলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ওদের দেখতে পাবো। সেই সময় চলছিল ডাকা ডাকির একটা লম্বা বিরতি,

অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই, হঠাৎ সাদা বালির ওপর একটা কালো ছায়া এসে দাঁড়ালো। সেই অন্ধকারেই দেখলুম, হরিণটা নদীর দিকে চেয়ে রয়েছে। নদী আমার পিছন দিকে, সুতরাং আমিও ধীরে ধীরে পিছন দকিে মুখ করে ঘুরে বসলুম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীর খানিকটা অংশ আমার চোখে পড়ছিল, কিন্তু দীর্ঘ সময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাঘিনীকে কোথাও দেখতে পেলুম না। তার ডাকও আর কানে ভেসে এল না।



এমন সময় অনেক দূর থেকে আর একটা হরিণ ডাকতে শুরু করায় বুঝতে পারলুম—বাঘিনী অনেক দূরে চলে গেছে আর সেই হরিণটার চোখে ধরা পড়েছে। ধীরে ধীরে উষার আলো ফুটে উঠলো। সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠলো সুন্দরবন, কে বলবে রাতের অন্ধকারে রহস্যময়ী প্রকৃতি ক্ষণিকের খেয়ালে তার গোপন আবরণ উন্মোচন করে কৌতুকের এমন উঁকি দিয়েছিল!

লক্ষ্মীখালের বাঘিনীকে পাবার আর কোন আশা রইলো না। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাকী, পারমিট এক্সটেন্‌সন্ করার কোন উপায় ছিল না। শেষের এই দিনটা আর একবার চেষ্টা করে দেখবো, তারপর নোঙর তুলে পাড়ী দেব। বেলা বেলা তিনটে নাগাদ মাচার উদ্দেশ্যে রওনা দিলুম, এবারেও কোন সঙ্গী নেই। আড়াই মাইল হেঁটে মাচায় উঠলুম, তখন যথেষ্ট বেলা রয়েছে। মাছ ধরার আশায় সলুইয়া ঝাঁক বেঁধে নদীর কাদায় বসে রয়েছে। আমার সামনের গাছে এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী ডালে উড়ে উড়ে খেলা করছিল। নানা রঙের পাখী, তাদের মধ্যে সরু ঠোঁট মধু ভূক ও টুনটুনী ছিল। পাখীগুলো যেমন হঠাৎ এসে কিচির মিচির করে ডাল ঝাঁকাঝাঁকি করলো, আবার তেমনি ভাবেই ঝাঁক বেঁধে হঠাৎ উড়ে গেল। এত কাছ থেকে পাখীদের খেলা দেখতে এত ভাল লাগছিল যে, তা বলবার নয়। পাখীরা চলে যেতেই সব সাড়া শব্দ ডুবে গেল।

এমন সময় একটা বড় শিঙেল হরিণ চোখে পড়লো। হরিণটা বনের ধার দিয়ে পাতা খেতে খেতে চলেছে। হঠাৎ খেয়াল হল হরিণটাকে মেরে যদি বাঘিনীকে টোপ দিই তাহলেও কি কোন সম্ভাবনা থাকবে না! কিন্তু হরিণটা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। এতক্ষণ গুটি গুটি হাঁটছিল, হঠাৎ তিড়িং করে এক লাফে বনের আড়ালে চলে গেল। দিনের বারো ঘণ্টা কেটে গেছে, এখন রাতের বারো ঘণ্টা বাকী। সেই অন্ধকার, সেই নিস্তব্ধতা—কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই। সময় যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।

হঠাৎ একটা শিহরণ খেলে গেল, গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। কেন এমন হল তা জানি না। আমার সামনে গাছের ফাকে একটা তারা জ্বল্ জ্বল্ করছিল, তারাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল ঠিক এইভাবে কোন পাতার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে বাঘিনীও দেখছে না তো! আমার মাচার উচ্চতা খুবই সামান্য, এ কথা মনে হতেই কেমন একটা ভয় ভয় করতে লাগলো। যদি বাঘিনীকে সময় মত দেখতে না পাই তাহলে কি হবে যেন ভাবতেই পারলুম না। এমন সময় মাথার ওপর

আর একটা তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। পিঠের গোটা চাদরটা সরে গিয়েছিল, চাদরটাকে পিঠের ওপর আবার তুলে দেব ভেবে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে চাদরের খুঁট্ খুঁজতে লাগলুম। খুঁট দুটোকে ধরবার জন্য যেই পিছন ফিরে নীচের দিকে তাকিয়েছি, অমনি বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মত চমকে উঠলুম। (আমার এত অস্বস্তির কারণ তাহলে এই!) তখন আমি কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছি। দেখলুম ঠিক মাচার তলায় বাঘিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাইফেলটা কোলের ওপর থেকে নেবারও সাহস হল না, যদি শব্দ হয়! এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বাঘিনী।

তার মাথা, বুক ও পেট আমার পায়ের তলায় কাঠ ও গাছের গুঁড়ির আড়াল পড়ায় শুধু পায়ের গোড়ালী ও ল্যাজের শেষ অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল বাঘিনী ডান কিংবা বাঁ দিক দিয়ে আসবে, পিছনের কাঁটা ঝোপ দিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ সেই দিক থেকেই সে এল। কি অসম্ভব অনুভূতি শক্তি, নিঃসাড়ে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো—যেখানে তার ভাইট্যাল্ পয়েন্টগুলোই আড়াল পড়ে গেছে। খুব ফাঁকা জায়গা ছাড়া বাঘ খোলা জমি দিয়ে হাঁটে না, বনের আড়াল নিয়েই তারা সন্তর্পণে চলাফেরা করে। যখন থামে, সেই আড়ালই হয় তার রক্ষা কবচ—এ বোধ শক্তি তার জন্মগত।

বাঘিনীকে চোখে পড়ার পর থেকে আর নড়বার জো ছিল না, রাইফেলের নলটা নীচু করে নামিয়ে দিলেই তার পিঠ স্পর্শ করবে। আমি তার শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলুম, এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বাঘিনী। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার করণীয় কিছুই ছিল না, গুলি করবার সুযোগ তখনই আসবে—যখন সে হেলানে-গাছটা আঁচড়াবার জন্য এগিয়ে যাবে। রাইফেলটা দু'হাতে স্পর্শ করে রয়েছি, কিন্তু তুলে নিতে সাহসে কুলোচ্ছিল না—যদি শব্দ হয়! মাত্র তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলের সব থেকে সজাগ প্রাণীটি।

দীর্ঘ এক মিনিট সময় সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, কি এক অজ্ঞাত কারণে মৃদু মৃদু দুলছিল শুধু ল্যাজের ডগাটুকু। আমি মানুষখেকো বাঘিনীর এতক্ষণ সান্নিধ্য সহ্য করতে পারছিলুম না, এক মারাত্মক ভুল করে বসলুম। এমন এক কাণ্ড করে বসলুম যে, লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় রইলো না, এমন কি সেই ভুলের ফলে আমার প্রাণ বাঁচানোর সমস্যা দেখা দিল। আমার অসুস্থতা, মাচার স্বল্পতা, সময় (গভীর রাত) ও বাঘিনীর এত ঘন-সান্নিধ্য— এতসব জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও শিকারী হিসেব দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ নেই।

[মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে ফিকাস গাছটায় নিঃশব্দে চড়ে বসার পর দেখা গেল, গাছটা সামনের দিকে ঝোঁকানো এবং পচা কাঠ আর শুকনো পাতায় ভর্তি। সেগুলো সরাতে গেলেই শব্দ আর নড়াচড়ার ফলে বাঘের নজরে পড়ার ভয়। এমন সময় পিছন থেকে বাঘটা নিঃশব্দে উঠে এল ঐ পথে, তারপর মাচার নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আশায় বাঘটা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং মড়ির কাছে যাবে। এমন সময় নীচে শুকনো পাতার মড়মড়ানি শব্দ, বাঘটা সেখানেই শুয়ে পড়লো। ভারসাম্য বজায় রেখে যতদূর সম্ভব গলা বাড়িয়ে বাঘের লেজ আর তার পিছনের পায়ের কিছুটা দেখতে পাওয়া গেল। এ হেন পরিস্থিতিতে সামান্য রকম আওয়াজ না করে গুলি করা যাবে না। নড়াচড়া করলেই পাতার মড়মড়ানি, অথচ ঠিক দশ ফুট নিচে জঙ্গলের সব থেকে সজাগ প্রাণীটি শুয়ে। ডান দিকের শেকড়ের ঝুরির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে বাঘের মাথাটা দেখতে পাওয়া গেল। যদি চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও বের করে দিতে পারতাম, তবে আমার বিশ্বাস সেটা সোজা গিয়ে তার নাকের ডগায় লাগতো। তার থুতনিটা মাটির সঙ্গে লাগানো, এবং চোখ দুটি বোজা ছিল। এর পরের সোয়া ঘণ্টা আমি একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম— জিম করবেট]

একটা হেস্ত নেস্ত হওয়া তখন একান্তই দরকার এবং তা করতে হবে এমন একটা প্রাণীর বিরুদ্ধে, যে মাত্র তিন ফুট নীচে দাঁড়িয়ে মতলবে লেজ নাড়ছে এবং জঙ্গলে তার তার মত সজাগ প্রাণী আর দ্বিতীয় নেই। বিশেষ করে সদ্য সন্তানহারা সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘিনী সে।

এমন সময় সেই অসম্ভব সর্বনেশে চিন্তা মাথায় এল। যা পূর্বে কখনও করিনি, করা উচিত নয় জেনেও। ভাবলাম—মাচার সামনের তক্তায় পা বাড়িয়ে একটু ঝুঁকে এক গুলিতে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই। ভুল! মারাত্মক ভুল করলাম আমি। যা ভুল করলাম আমি, তা যেন কখনও কোন শিকারী না করেন। সেই সামান্যতম দূরত্বের ব্যবধান আমি মূর্খের মত অথবা অদৃষ্টের নিগূঢ় ইঙ্গিতে গুলি করবার জন্য সামান্যতম নড়াচড়া করে আমি আমার বিপদকেই শুধু ডেকে আনলাম।

মতলব মত সামনের সেই তক্তায় অত্যন্ত সন্তর্পণে পা রাখলাম, রাইফেলটাও তুলে নিলাম। এতক্ষণ কোন শব্দ হয়নি, বাঘিনীও টের পায়নি। যেই সামনের দিকে ঝুঁকে গুলি করতে গেলাম, অমনি শরীরের ভারে তক্তায় মচ করে একটা শব্দ হল। অত্যন্ত হাল্‌কা ক্ষীণ শব্দ, তবু তা বাঘিনীর কানে পৌঁছল।

ফ্যাঁচ্ করে নাক ঝাড়ার একটা শব্দ করেই বাঘিনী মুখ তুলে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে গাছটাকে এমন জোরে ধাক্কা মারলো যে, অপলক মাথাটা সাংঘাতিকভাবে দুলে উঠলো। পলকের মধ্যে গ-র্-র্ শব্দটা উচ্চ পর্দায় উঠে গেল, শূন্যে লাফিয়ে উঠলো বাঘিনী। অপলক মাচার কয়েকটা ডাল পালা খসে গেল, আর আমি পড়তে-পড়তেও মাচার কোণে সেঁটে রইলুম এক আশ্চর্য দৈব মহিমায়! সেই মুহূর্তে আর কি কি ঘটেছিল জানি না, তবে কোন দ্রুতগতি কলমই তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, শুধু অনুভূতি দিয়ে তাকে শিউরে শিউরে বুঝি অনুভব করতে হয়—যা ব্যক্ত করার কোন সঙ্গতি থাকে না।

এক মিনিট সময় সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, কি এক অজ্ঞাত কারণে মৃদু মৃদু তুলছিল শুধু ল্যাজের ডগাটুকু। আমি মানুষখেকো বাঘিনীর এতক্ষণ সান্নিধ্য সহ্য করতে পারছিলুম না, এক মারাত্মক ভুল করে বসলুম। এমন এক কাণ্ড করে বসলুম যে, লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় রইলো না, এমন কি সেই ভুলের ফলে আমার প্রাণ বাঁচানোর সমস্যা দেখা দিল। আমার অসুস্থতা, মাচার স্বল্পতা, সময় (গভীর রাত) ও বাঘিনীর এত ঘন-সান্নিধ্য—এতসব জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও শিকারী হিসেব দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ নেই।

[মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে ফিকাস গাছটায় নিঃশব্দে চড়ে বসার পর দেখা গেল, গাছটা সামনের দিকে ঝোঁকানো এবং পচা কাঠ আর শুকনো পাতায় ভর্তি। সেগুলো সরাতে গেলেই শব্দ আর নড়াচড়ার ফলে বাঘের নজরে পড়ার ভয়। এমন সময় পিছন থেকে বাঘটা নিঃশব্দে উঠে এল ঐ পথে, তারপর মাচার নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আশায় বাঘটা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং মড়ির কাছে যাবে। এমন সময় নীচে শুকনো পাতার মড়মড়ানি শব্দ, বাঘটা সেখানেই শুয়ে পড়লো। ভারসাম্য বজায় রেখে যতদূর সম্ভব গলা বাড়িয়ে বাঘের লেজ আর তার পিছনের পায়ের কিছুটা দেখতে পাওয়া গেল। এ হেন পরিস্থিতিতে সামান্য রকম আওয়াজ না করে গুলি করা যাবে না। নড়াচড়া করলেই পাতার মড়মড়ানি, অথচ ঠিক দশ ফুট নিচে জঙ্গলের সব থেকে সজাগ প্রাণীটি শুয়ে। ডান দিকের শেকড়ের ঝুরির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে বাঘের মাথাটা দেখতে পাওয়া গেল। যদি চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও বের করে দিতে পারতাম, তবে আমার বিশ্বাস সেটা সোজা গিয়ে তার নাকের ডগায় লাগতো। তার থুতনিটা মাটির সঙ্গে লাগানো, এবং চোখ দুটি বোজা ছিল। এর পরের সোয়া ঘণ্টা আমি একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম—জিম করবেট]

একটা হেস্ত নেস্ত হওয়া তখন একান্তই দরকার এবং তা করতে হবে এমন একটা প্রাণীর বিরুদ্ধে, যে মাত্র তিন ফুট নীচে দাঁড়িয়ে মতলবে লেজ নাড়ছে এবং জঙ্গলে তার তার মত সজাগ প্রাণী আর দ্বিতীয় নেই। বিশেষ করে সদ্য সন্তানহারা সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘিনী সে।

এমন সময় সেই অসম্ভব সর্বনেশে চিন্তা মাথায় এল। যা পূর্বে কখনও করিনি, করা উচিত নয় জেনেও। ভাবলাম—মাচার সামনের তক্তায় পা বাড়িয়ে একটু ঝুঁকে এক গুলিতে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই। ভুল! মারাত্মক ভুল করলাম আমি। যা ভুল করলাম আমি, তা যেন কখনও কোন শিকারী না করেন। সেই সামান্যতম দূরত্বের ব্যবধান আমি মূর্খের মত অথবা অদৃষ্টের নিগূঢ় ইঙ্গিতে গুলি করবার জন্য সামান্যতম নড়াচড়া করে আমি আমার বিপদকেই শুধু ডেকে আনলাম।

মতলব মত সামনের সেই তক্তায় অত্যন্ত সন্তর্পণে পা রাখলাম, রাইফেলটাও তুলে নিলাম। এতক্ষণ কোন শব্দ হয়নি, বাঘিনীও টের পায়নি। যেই সামনের দিকে ঝুঁকে গুলি করতে গেলাম, অমনি শরীরের ভারে তক্তায় মচ করে একটা শব্দ হল। অত্যন্ত হাল্কা ক্ষীণ শব্দ, তবু তা বাঘিনীর কানে পৌঁছল।

ফ্যাঁচ্ করে নাক ঝাড়ার একটা শব্দ করেই বাঘিনী মুখ তুলে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে গাছটাকে এমন জোরে ধাক্কা মারলো যে, অপলক মাথাটা সাংঘাতিকভাবে দুলে উঠলো। পলকের মধ্যে গ-র্-র্ শব্দটা উচ্চ পর্দায় উঠে গেল, শূন্যে লাফিয়ে উঠলো বাঘিনী। অপলক মাচার কয়েকটা ডাল পালা খসে গেল, আর আমি পড়তে-পড়তেও মাচার কোণে সেঁটে রইলুম এক আশ্চর্য দৈব মহিমায়! সেই মুহূর্তে আর কি কি ঘটেছিল জানি না, তবে কোন দ্রুতগতি কলমই তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, শুধু অনুভূতি দিয়ে তাকে শিউরে শিউরে বুঝি অনুভব করতে হয়—যা ব্যক্ত করার কোন সঙ্গতি থাকে না।

আমি শুধু দেখলাম—বাঘিনী আমার সামনে, আমার মাথার এক হাত দূরে লাফিয়ে উঠেছে সে, মুহূর্তের মধ্যে ট্রিগারে চাপ পড়েছিল, প্রচণ্ড শব্দ হল। আক্রমণ প্রতিহত হল কিনা বোঝবার পূর্বেই বাঘিনী আমায় মুহূর্তে অতিক্রম করে গেল, অন্ধকারে এর বেশী আর কিছুই নজরে এল না। চাকতের জন্য আমার চোখের সামনে তার বিশাল চেহারাটা ভেসে উঠেছিল, তারপরে গুলি করার শব্দ। শব্দটা মিলিয়ে যাবার পূর্বেই শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় গাঁক্ করে একটা শব্দ করলো, তারপর ছয়-সাত হাত দূরে বালির উপর থপ্ করে আছড়ে পড়লো। চারিদিকে তখন ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের বুক চিরে তার হাঁচোড় পাঁচোড় করে এগিয়ে যাওয়ার শব্দ এল একবার, তারপর কিছু নেই। শুধু মৃত্যুর স্তব্ধতা!

আমি তো কাঠ হয়ে বসেছিলুম ভাঙ্গা মাচায়, করার আর কিছু ছিল না। শুক্নো গলাটা ভেজাতে পারলাম না, টর্চটা জ্বালাতে পারলাম না, পিঠে চাদরটা চাপা দেবো তাও হল না। প্রয়োজনীয় সব জিনিষগুলোই তখন নীচে পড়ে গেছে, শুধু গুলি ভরা রাইফেলটা নিয়ে অসহায়ের মত সেই অন্ধকারে অনুচ্চ ভাঙা মাচায় আঠার মত সেঁটে রইলুম। বাঘিনীর আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর কতক্ষণ কেটে গেল, আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার চার পাশটা দেখে নিলুম। বাঘিনীর আক্রমণের পর এই প্রথম আমার নড়াচড়া। তখনও ভোর হয়নি, ক্রমে ভোর হল। আকাশে আলো ফুটে উঠলো। পাখিরা ডেকে উঠলো।

আমার জীবনে যখন আবার একটা সকাল এল তখন তাকে উপভোগ করবার জন্য আপাততঃ একটা সিগারেট খাওয় খুবই প্রয়োজন। ভয়ে নয়, কি এক ভাবনায় বিভোর হয়ে বসেছিলুম—এতক্ষণ নীচে নামা হয়নি। অথচ এই সুন্দরবনেই আমি বাঘের সন্ধানে কিবা দিন, কিবা রাত্ত পায়ে হেঁটে চলেছি—জানি এ কথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করবেন না। ক্রমে সূর্য উঠলো, নীচে নেমে দেখি বাঘিনীর পায়ের ছাপ। যেখানে সে আছাড় খেয়ে

পড়েছিল, সেখানে একটা গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তারপর টানা টানা কতকগুলো রক্তাক্ত দাগ বনের গভীরে চলে গেছে। একটা টানা নালা পার হয়ে ঘাস বনে সে চিহ্ন ঢাকা পড়ে গেছে, তাকে অনুসরণ করার মত আর কিছুই পাওয়া গেল না।

গুলিটা যদি ঠিক জায়গায় লেগে থাকে, তাহলেই অনতি বিলম্বেই তার মৃত্যু ঘটবে। অনেকের ধারণা, বাঘের শরীরে ঠিকমত রাইফেলের গুলি প্রবেশ করলেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কথাটা সত্য। কিন্তু ঠিকমত বলতে আমরা কি বুঝি! গুলিটা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি মাংস ভেদ করে গেল, কিংবা তার আশ পাশে লাগলো—অথচ হাড়-গোড় ভাঙ্গতে পারলো না, অথবা হাড়ের কোন জোড়ের মধ্যে আটকে রইলো। এ সব ক্ষেত্রে বাঘটাকে মারাত্মকভাবে শুধু জখমই করা হল। গুলিটা যতক্ষণ না হৃদয় এলাকায় ছাতার মত খুলে টিস্যু বা নার্ভগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে হাড় ভাঙ্গে, ততক্ষণ তার মৃত্যু ঘটবে না। এখানে গুলি করা হল আচম্বিতে—অন্ধকার রাত্রে, টর্চটা জ্বালাবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বাঘিনী লাফিয়ে উঠতেই ট্রিগার টানা হল কেতাবী ঢংয়ে, নিশানা নেবারও ফুরসৎ পাওয়া গেল না সেই ভয়াবহ মুহূর্তে। বাঘিনী একটা শব্দ করে শুধু জানিয়ে দিয়ে গেল যে, গুলিটা তার গায়ে লেগেছে। এর বেশী জানার আর সুযোগ ছিল না।

অতএব ঠিকমত কথাটার একটা অর্থ পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে আন্দাজ কথাটারও। যারা দীর্ঘকাল ধরে রাইফেল ছুঁড়ে আসছেন, তাদের আন্দাজটা আর পাঁচ জনের মত যে নয়, আশাকরি পাঠকেরা আমার সঙ্গে দ্বিমত হবেন না।

গুলি খাওয়া আহত বাঘিনীর অনুসন্ধান করেও কোন ফল হল না। পরপর তিনবার সুযোগ দিয়েও তখন আশা করলুম—প্রকল্পের আওতায় সে আরও কিছুকাল বাঁচবে, আবার তার ডাক শোনা যাবে।

দেখতে দেখতে জোয়ার এসে গেল, পাশ খাল আর নালাগুলো ভরে উঠলো। সলুইরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসলো কাদায় পা ডুবিয়ে,

যেখানে ঢেউগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল। জোয়ারের জলে ভেসে আসা পাতা খেতে হরিণরা তখন ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রের বাতাস এসে পাতায় পাতায় যখন বেজে উঠেছে, সেই শব্দকে আড়াল করে নিঃশব্দে টহল দিয়ে ফিরছে তখন এক অনন্য-সৌন্দর্য—সুন্দরবনের শুধু আতঙ্ক নয়, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' —যার গর্বে সুন্দরবন আজো গরবিনী!



বাদা-অঞ্চলের চ'ল্‌তি ভাষা

১। ফোড়ন-খাল— যে খাল বন ফুঁড়ে বড় নদীতে পৌছেচে।

২। শিস্— সরু মজা-খাল, বনের মধ্যেই যার শেষ হয়েছে।

৩। গেরাপী— নোঙর।

৪। ও'য়াড়ী— বন্য জন্তুর অজ্ঞাতে তার চিহ্ন অনুসরণ করা।

৫। হরিণের-সিঁড়ি— যে পথে হরিণ নিত্য চলা-চল ক'রে অসংখ্য খুরের চিহ্ন এঁকে যায়।

৬। মৌলী— মধুয়াল, যারা সুন্দরবনে মধু কাটে।

৭। পিটেল্— ফরেষ্ট পেট্রোল বোট।

৮। শুলো— সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলের গাছের শিকড় যে মাটি ফুঁড়ে বাতাস নেয়।

৯। ছোট্— ছোট ডিঙি, যা বড় নৌকোর সঙ্গে থাকে সরু খালে প্রবেশের জন্য।

১০। ট্যাঁক্ বা টেক্— যেখানে নদী বা দ্বীপ বাঁক নিয়েছে, সেই কোণকে বলে—ট্যাঁক্ বা টেক্।

১১। সাপট্—

১২। বেগো-ভূত— ব্যাঘ্র-কবলিত মৃতের অতৃপ্ত আত্মা।

১৩। পিসু-পোকা— অত্যন্ত ক্ষুদ্র মক্ষিবিশেষ, খালি চোখে দেখা যায় না।

১৪। কামট্— ছোট ও নিকৃষ্ট জাতের হাঙর।

১৫। পেলাম— শিকারীর সাকৃরেদ।

১৬। সাইজ-করা— গোপনে শিকার সংগ্রহ করা।

১৭। বাওয়ালী— যারা মন্ত্রের জোরে বনের বিপদ-আপদকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। বন-বিবি ও দক্ষিণ-রায়ের ভক্ত পূজারী, গ্রাম্য-হেকিমও বটে। শোনা যায় এক সময় বাওয়ালীরা বাঘ-বন্ধনী জানতো।